

৬৬১



সৌন্দর্যদর্শন

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী



861

3941

# সৌন্দর্যদর্শন

প্রথম নির্মাণ কে টুকু



বিশ্বভারতী প্রশালয়  
২ বঙ্গিক্ষম চাটুজে স্ট্রীট  
কলিকাতা



বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১০৮

প্রকাশ ১৩৬১ আবণ

S.C.E.R.T. West Bengal

Date.....

Age Pg..... ৫৪২০

111.85

PRA

মূল্য আট আনা

প্রকাশক 'শ্রীপুলিনবিহারী মেন

বিশ্বভারতী। ৭৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর 'শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

আদমিশন প্রেস। ২১১ কর্ণফোলিশ স্ট্রিট। কলিকাতা ৬

## সূচীপত্র

সৌন্দর্য-দর্শনের বিষয়বস্তু	১
সৌন্দর্য : প্রকৃতির ও শিল্পের	২
সৌন্দর্যের আধার ও বিষয়বস্তু	৩
সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য	৪
অনুকরণ ও সংষ্ঠি	৫
শিল্পীর ব্যক্তিত্ব	১০
শিল্পে বিচারবৃক্ষি ও প্রেরণার স্থান	১২
শিল্পের সার্থকতা ও আনন্দান	১৪
শিল্পের সার্থকতা ও শিক্ষাদান	১৫
শিল্পের সার্থকতা প্রকাশকার্যে	১৭
ভাবের আদানপ্রদান	১৮
সৌন্দর্যের স্বরূপ	২১
মহান् সৌন্দর্য ও কুশ্মান্তা	২৩
সত্য শুন্দর ও মঙ্গল	২৪
কাব্যের সৌন্দর্য	২৮
চিত্রকলা ও তাহার প্রকাশপদ্ধতি	৩৩
ভাস্তৰ্য ও সংগীত	৪১
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন	৪৪
অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন	৪৯

। মলাটের চিত্র ।

প্রজ্ঞাপারমিতা । জাভা-ভাস্তৰ্য । লাইডেন মিউজিয়ম, হলাওও । অঘোদশ খণ্টাদ  
চিত্রখানি শ্রীবিমলকুমার দত্তের উদ্যোগে প্রাপ্ত

শিল্পাচার্য  
শ্রীঅবনীজ্ঞনাথ ঠাকুর  
স্মরণে

## ୧. ମୌନଦୟ-ଦର୍ଶନେର ବିଷୟବସ୍ତୁ

ମୌନଦୟେର ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର କରିଯାଅବିଯାହନେଛନ୍ତି । ତାହାଦେର ଏଇସକଳ ବିଚାର ଓ ଗବେଗଣ ଲଇଯା ଏକଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ଫଟି ହଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକେ ଦର୍ଶନେରଇ ଏକଟି ଶାଖା ବଳା ଯାଏ । ମୌନଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦାର୍ଶନିକଦେର ବହୁ ବିଚାର-ବିତର୍କ ଏଇଥାନେ ପାଇଁଯାଏ । ସୁତରାଂ ତାହାଦେର ସମାଲୋଚନାର ସମଟିକେ ମୌନଦୟ-ଦର୍ଶନ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ଯାଏ ।

ମୌନଦୟ ବିଚାର କରା ଏବଂ ମୌନଦୟ ଉପଲକ୍ଷି କରା ବା ସ୍ଫଟି କରାଯା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଛେ । ସୁତରାଂ ଇହା ମନେ କରା ଭୁଲ ହଇବେ ଯେ, ମୌନଦୟ-ଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଯାବା ଆଲୋଚନା କରିଯା ରୂପଦକ୍ଷ କି ରୂପକାର ହେଉଯା ଯାଏ । ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ସେମନ ନୈତିକ ଉତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଯା ଯାଏ ନା ସେଇରପ ଆୟଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଲେ ତାର୍କିକ ହେଉଯା ଯାଇତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଭୁଲ ନୈଯାଯିକ ହେଉଯା ଯାଇବେ ଏମନ କଥା ନାହିଁ । ଏହି କଥାଗୁଲି ମୌନଦୟ-ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ମନେ ରାଖିତେ ହଇବେ । କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲିଯା ମୌନଦୟ-ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନାର କୋମ୍ବୋ ବିଶେଷ ମାର୍ଗକତା ନାହିଁ ଏକପ ମନେ କରା ଭୁଲ ହଇବେ । ମୌନଦୟ ଆମରା ସକଳେଇ ଅନ୍ତବିଶ୍ଵର ଉପଲକ୍ଷି କରି ଓ ତଦକରନ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଟି ଉପଭୋଗ କରି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷି ସହିତଇ ଆମାଦେର ବିଚାରବୁକ୍ଷି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଗିଯା ଓଠେ ଏବଂ ଆମାଦେର ଜାନିତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ, ଏହି ଆନନ୍ଦେର ଉତ୍ସ କୋଥାଯା ଏବଂ ଇହାର ସରପ କି । ଏହି ପ୍ରକୃତି ତଥନ ଉତ୍ତର ଥୋଜେ ଏବଂ ଯତକ୍ଷଣ ନା ଯୁକ୍ତିମଂଗତ ଉତ୍ତର ଖୁଜିଯା ପାଇ ତତକ୍ଷଣ ଆମାଦେର ହନ୍ଦୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା ଏବଂ ମୌନଦୟେର ଉପଲକ୍ଷିଓ ଅପୂର୍ବ ରହିଯା ଯାଏ । କାରଣ ହନ୍ଦୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିଃମ୍ପର୍କ ନହେ, ବରଂ ତାହାଦେର

একের সহিত অপরের ঘোগ আছে ; এইজন্য দুইয়েরই সংঘোগ ভিন্ন পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না। ব্যক্তির সমগ্রতা দুইয়েরই মিলনে এবং দুইয়েরই তৎপৰাধন ভিন্ন তাহার চরম পরিত্থিপ্তি আসে না। সেইভাবে রসান্বৃতিকে মৌন্দর্য-দর্শন ঠিক প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করিলেও রূপ-বিশ্লেষণকারীর আনন্দোপলক্ষির প্রসারে সহায়তা করে এবং পরোক্ষভাবে রসান্বৃতিকেও জাগ্রত করে।

মৌন্দর্য-দর্শন ফলিত-বিজ্ঞান নহে ; ইহা রূপবিচারের বা রূপসৃষ্টির কোনো বীধা-ধরা নিয়মাবলী প্রকাশ করে না। কিন্তু এই কারণে রূপ সমস্যে এইসব বিচার-বিশ্লেষণ সার্থকতাহীন বৃথা তর্কজাল মাত্র নহে বরং মৌন্দর্য-দর্শনের সহায়তায় বিশ্লেষণকারীর রসান্বৃতি বিচার-বিতর্ক দ্বারা শোধিত ও উন্নত হইয়া তাহার সম্মুখে রূপজগতের আবরণ খুলিয়া দেয়।

## ২. মৌন্দর্য : প্রকৃতির ও শিল্পের

প্রথমেই মনে হয় যে, যে ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় মৌন্দর্যের অভ্যন্তর প্রকাশ আমরা নিত্যই দেখিতে পাই মে ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির কোনো সার্থকতা আছে কি ? ঝুতুতে ঝুতুতে এত ফুলের মেলা, প্রতিদিন প্রভাতে সক্ষ্যায় আকাশে কত রঙের খেলা, কোনো শিল্পীর তুলি কি এগুলি ধরিতে পারে ? তবে কেন আমরা ছবি, গান, কবিতা রচনা করিয়া, নাচিয়া<sup>১</sup> গাহিয়া, পাথর কুঁদিয়া, এককথায় শিল্প-রচনা<sup>১</sup> করিয়া, মৌন্দর্যকে ধরিতে চাই ? ইহা কি ব্যর্থ সাধনা ? এই কথার সবচেয়ে বড় উত্তর এই যে, শিল্পের মৌন্দর্য যাহা মাঝের দ্বারা

১ এখানে 'শিল্প' শব্দের অর্থ ব্যাপক ভাবে ধরিতে হইবে। কাব্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্তৰ ও নৃত্যগীত — এই সকলকেই শিল্প (আর্ট) বলা চলে।

স্বষ্টি তাহা প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেয়ে উপর এবং অধিক বৈভবশালী। ইংরেজ কবি কৌটস এই কথা ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে, মানবের রূপসূষ্ঠি দুশ্শরের সৃষ্টি হইতে কি করিয়া অধিক মহিমা লাভ করিতে পারে? কিন্তু ইহার কারণ অমুসন্ধান করিতে বেশিদূর যাইতে হইবে না। প্রথমত, আমরা দেখি কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্মুখে বেশিক্ষণ আমরা রসগ্রাহী মন লইয়া দাঢ়াইতে পারি না। প্রকৃতি আমাদের চোখে এতই বাস্তব যে তাহাকে আমরা প্রয়োজন হইতে ভিন্ন করিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত প্রকৃতির যোগ এত নিবিড় যে তাহাকে রূপদক্ষের দৃষ্টি দিয়া দেখা অনেক সময়ই সাধনাসাপেক্ষ। সন্ধ্যার আকাশ দেখিয়া মনে করি, রাত্রি নামিল বাড়ি ফিরিতে হইবে। সুন্দর ফুল দেখিলে তুলিয়া লইতে যাই পূজার জন্য কি প্রিয়জনকে উপহার দিতে। স্বতরাং প্রকৃতির সামনে আমাদের কার্যকরী বুদ্ধিকে বেশিক্ষণ আটক রাখা যায় না। সৌন্দর্যপলকি বা রসাস্বাদন করিতে হইলে মনকে সাধারণ কামনাবাসনার উপরে লইয়া যাইতে হয়। শিল্পে যখন কোনো সৌন্দর্য দেখি তখন জানি যে বস্তুটি ব্যাবহারিক প্রয়োজনের অযোগ্য, এক হিসাবে হয়তো অবাস্তব; স্বতরাং আমাদের কার্যকরী বুদ্ধি সেখানে নিরস্ত হইয়া থাকে এবং রসপিপাস্ত মনই জাগিয়া থাকে, স্বতরাং শিল্পের সৌন্দর্য বেশি করিয়া পাই। বিতীয়ত, আমরা দেখি প্রকৃতির সব বস্তুই একটি কঠিন নিয়মে চলে; কার্যকারণসূত্রে তাহারা গাঁথা। কিন্তু সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য তাহার নিজস্বপ্রকাশে; তাহাতে যেন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, সৌন্দর্য যেন একটি বিশুল্ক জীলা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য এই লীলার ভাব আমরা পাই, কিন্তু মাঝের শিল্পসৃষ্টি যেখানে সার্থক দেখানে এই ভাবই সমগ্রভাবে বিরোজ হইতে দেখি, কারণ শিল্পী তাহার সৃষ্টির মধ্য

দিয়া তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যোপলক্ষি এবং অবাধ কল্পনার পরিচয় দিয়া থাকেন। এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতিকেও কোনো-এক মহাশিল্পী বা স্থষ্টিকর্তার রচনা বলিয়া মাঝুষ যখন ভাবিতে পারে তখনই সে প্রকৃতিতে এই মহান् সৌন্দর্যের লীলা ওতপ্রোত দেখিতে পায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিকে এমন ভাবে কেবল কয়েকজন মরমী কবি ও সাধকই দেখিতে পারিয়াছেন। সাধারণের কাছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপেক্ষা শিল্পের সৌন্দর্য আদরণীয় এবং সৌন্দর্য-দর্শনেও শিল্পকথাই বিশেষ করিয়া আলোচিত হইয়া আসিতেছে।

### ৩. সৌন্দর্যের আধার ও বিষয়বস্তু

প্রত্যেক শব্দের অর্থ আছে, সেইটির দ্বারা কোনো একটি বস্তুকে বোঝায়। বস্তুটি বিষয় এবং শব্দটি হইল তাহার আধার। বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনায় যেসকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাদের অর্থেই আমাদের আবশ্যক, তাহাদের শুনিতে কেমন লাগে বা লিখিলে কেমন দেখায়—ইহা ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কবিতায় গানে শব্দের দ্রুই দিকই—তাহার অর্থসম্পদ ও শ্রাতিমাধুর্য অর্থাৎ তাহার বিষয় ও আধার উভয়ই—প্রয়োজনীয় ; এককথায় শিল্পে কি রচনা করিলাম এবং কেমন করিয়া রচনা করিলাম দ্রুইই জানিতে হইবে। রচনার বিষয়বস্তু ও প্রণালী উভয়েরই এখানে সমান গুরুত্ব, কোনোটিকেই ছোট করা চলে না। কোনো শিল্পে বিষয় একটু প্রধান হয়, যেমন নাটকে ও গল্পে বা প্রতিকৃতি-চিত্রে। অবার কোনো শিল্পে আধারই মুখ্য, যেমন আল্পনা-রচনা বা স্তুরমৃষ্টি। কিন্তু পরিমাণে কমবেশি হইলেও গুরুত্বে এবং প্রয়োজনীয়তায় দ্রুইই সমান।

প্রকৃত শিল্পে আধার ও বিষয়বস্তু এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকে

ସେ ତାହାଦେର ପୃଥକ ଅନ୍ତିମ ବୋଲା ଯାଇ ନା । ଏକଟି ଶୁନ୍ଦର ଭାବସନ୍ଧି କବିତା ଅନ୍ତାଯାମ ଅନୂଦିତ ହିଲେ, ଏମନକି ମେଇ ଭାଷାତେହି ଅର୍ଥ କବିତେ ଗେଲେ, କବିତାଟିକେ ହାରାଇ ; କାରଣ, ଅର୍ଥ ବା ବିସୟବସ୍ତୁ ଏକଇ ଥାକିଲେও ଶବ୍ଦ ଛନ୍ଦ ମିଳ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆଧାର ତାହା ଭିନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କବିତାର ରମାସ୍ତର ଘଟେ । ଏକଟି ସାର୍ଥକ କବିତାର ଅର୍ଥକେ ଗଞ୍ଜେ ବଲା ଯାଇ ନା, କାରଣ କବି ତାହାର କଥା କବିତାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାଷାଯ ବଲିଆଛେ । ଅର୍ଥ ବା ବିସୟବସ୍ତୁ ଅନେକଟା ତାହାର ପ୍ରକାଶଭନ୍ଦିର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ । ଶବ୍ଦଚଯନ ଛନ୍ଦ ମିଳ ଏଣ୍ଣିଲି କବିତାର ବାହ୍-ଅଲଂକାର ମାତ୍ର ନହେ, ବରଂ ଏଇଣ୍ଣିଲିଇ କବିତାର ଅନ୍ତ ଏବଂ ଜୀବଦେହେର ଅନ୍ତପ୍ରତ୍ୟଦେହ ମତି ଇହାଦେର ସମଗ୍ରୀ ରଚନାଶୈଳୀର ମୂଳଭାବଟିର ସହିତ ଅଥାତ ଯୋଗ ଥାକେ । ଶିଳ୍ପଗାଲୀକେ କେବଳ କଳାକୌଶଳ ବା କାରିଗରିର ଗୁଣ ବଲିଆ ଛୋଟ କରା ଭୁଲ, କାରଣ ଏଣ୍ଣିଲି ଶିଳ୍ପୀର ବିସୟବସ୍ତୁ ବା ଭାବଭାବନାର ସହିତ ଅନ୍ତାନ୍ତରିକ୍ଷପେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଶତ୍ରୁର ଆନନ୍ଦେ ଏଇମକଳ ଅଂଶେରି ଦାନ ରହିଆଛେ ; ଇହାଦେର ସବାକାର ସୁହୃଦୀ ଓ ଶୁନ୍ଦର ସମସ୍ତୟେଇ ଶିଳ୍ପ ମହିମାଧିତ ହଇଯା ଓଠେ । ବଡ଼ କବିର ପ୍ରତିଟି କଥାଟି ଶାସ୍ତ୍ରତ, ତାହାର ବଦଳେ ଅନ୍ୟ କୋନୋ କଥା ବସାଇଲେ କବିତା ନଟ ହଇଯା ଯାଇ । ମେଇକୁପ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକରେର ପ୍ରତିଟି ବେଖା ଆବର ବଜେର ଟାନ ଅପରିହାର୍ୟ ମନେ ହୁଏ । ଏଇକୁପେ ଆଧାର ଯାହାକେ ( ବିସୟବସ୍ତୁକେ ) ଧାରଣ କରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ତାହାର ସମକଳ ହଇଯା ଓଠେ ।

#### ୪. ମୌନର୍ଥେର ବିସୟବସ୍ତୁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ

ଗାଛେର ପାଥିଟି ସତ୍ୟ, ଆବର ଛବିତେ ଆକାଶ ପାଥି ମିଥ୍ୟା— ଇହାତେ ମନେହ ନାହିଁ । କବିତା ଗଲ୍ଲେର ଭାବଭାବନା ବା ଘଟନା ପ୍ରଭୃତି ଏକରକମ ମିଥ୍ୟାଇ ବଲିତେ ହଇବେ । ତବୁ ଏକ ହିସାବେ ତାହାଦେର ବାନ୍ଦବଜଗତେର ଭାବଭାବନା ହଇତେ ଅଧିକତର ସତ୍ୟ ବଲା ଯାଇ, କାରଣ ବାନ୍ଦବଜଗତେର

যাহা কিছু তাহাতে মাঝের কল্পনার ছায়া পড়ে না। শিল্পবস্তুর সত্য এই কল্পনার সত্য। গাছের পাথি ঠিক কিরকম দেখিতে এবং তাহাকে দেখিলে কিরকম মনে হয় — তাহা কবি বা চিত্রকর ভাবেন না; সেই পাথি তাহার ভাবজগতে যে রূপ নিয়াছে তাহাই তিনি আমাদের ধরিয়া দেন এবং এই রূপহষ্টির মধ্যে যে সার্বভৌম ভাবটি আছে উহাই শিল্পী ব্যতীত অপরের প্রাণেও ভাব জাগ্রত করে। মাঝে বিশ্বপ্রকৃতিকে কেমনভাবে দেখে তাহাই গানে কবিতায় ছবিতে বলিয়া যায়, অপর দিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বস্তুগুলির যথার্থ স্বরূপ লিখিয়া রাখে। উভয়েই সত্য, কিন্তু দুই ব্রকমের বা দুই স্তরের। এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি প্রকৃত সত্য তাহা বলা যায় না, কারণ বুদ্ধির সত্য এবং ভাবের সত্য উভয়কে পাশাপাশি রাখিয়া বুদ্ধি দিয়া বিচার করা চলে না। বুদ্ধি ও ভাবের উধৰে অপর কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিলে হয়তো এই বিচার সম্ভব হইত। কবি ও দার্শনিকগণের মধ্যে কয়েকজন শিল্পের সত্যকেই শুধু স্বীকার করেন, অন্য দিকে কয়েকজন বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যকেই পরম মূল্য দিয়াছেন।

## ৫. অনুকরণ ও স্থষ্টি

এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিল্প কোনো প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণ বা প্রতিলিপি, না, ইহা স্বাধীনস্থষ্টি? গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে কবি চিত্রকর মূর্তিকার ও গায়ক ইহারা সকলেই অনুকরণকারী, এবং তাহাদের জীবন বৃথা সাধনায় অপব্যাপ্তি করেন। যে বস্তু প্রকৃতিতে আমরা নিয়েই পাই তাহা অনুকরণ করিয়া বা প্রতিলিপিত করিয়া কি লাভ? অস্তাচলে বিদ্যায়সূর্যের বিচির বর্ণসম্ভার প্রতি সক্ষ্যাত্ম প্রকৃতি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তবে কেন শিল্পী তাহাকে তুলিতে ফুটাইয়া

তোলেন ও আমরা সেই ছবি দেখি ? ইহা কি শুধুই অবসর-বিনোদন ? ইহার উভয়ে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, শিল্পী অমুকরণ করেন না। শিল্পী প্রকৃতিকে দেখেন বটে, কিন্তু প্রকৃতির রূপকে আশ্রয় করিয়া তাহার সামনে ন্তৰন একটি ভাবরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে এবং সেই ন্তৰনের ছাপই আমরা শিল্পীর স্থষ্টিতে পাই। শিল্প যে কেবলমাত্র প্রতিলিপি নহে তাহার সমক্ষে এই ক'টি কথা বলা যাইতে পারে : প্রথমত, শিল্পী জানেন যে অমুকরণ করায় কোনো সার্থকতা নাই এবং যাহা কেবলমাত্র বাস্তবজগতের ছায়া বা প্রতিলিপি তাহা আমাদের চোখকে অতিশীঘ্ৰই ঝাল্ট করে। শিল্পী কেন বৃথা সাধনা দ্বাৰা আমাদের পীড়িত কৰিবেন ? বলা যাইতে পারে যে, শিল্প আমাদের সংকীৰ্ণ জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত কৰে এবং যাহা আমরা পাই না বা জানি না তাহাই শিল্পের মধ্য হইতে আহরণ কৰিয়া উপভোগ কৰি ; যেমন নাটকে উপন্যাসে বছবিচ্ছি দুঃখ-সুখ ভাবভাবনা প্ৰেম ঈর্ষা দুৱাশাৰ বৰ্ণনা পড়িয়া উপভোগ কৰি, যাহা সাধাৰণ মানুষে তাহার বৈচিত্ৰ্যহীন জীবনের ছোট গণিৰ মধ্য পায় না। কিন্তু এই যুক্তি সংগত নহে। বড় শিল্প বা প্রকৃত শিল্প কখনও কোনো ন্তৰন বিষয়বস্তু দ্বাৰা আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিতে চেষ্টা কৰে না বা আমাদের আবেগগুলিকে প্রশ্ৰয় দেয় না। ইহা শুধু এক ধৰনের মন্দ নাটক উপন্যাস এবং ছবিগানে হইয়া থাকে। যে শিল্প বড় এবং সুন্দৰ, তাহাতে বিষয়বস্তু খুবই সাধাৰণ এবং সৱল হয় এবং ইহাতে ভাবকে প্রশ্ৰয় না দিয়া ভাবকে মনন কৰা হয় ; এই মনন কৰাৰ যে আনন্দ তাহাই শিল্পের এবং এই আনন্দ ভাবাবেগেৰ সুখ হইতে ভিন্ন। সাধাৰণ জীবনে আমরা ভাবেৰ দ্বাৰা চালিত হই ; হাসি কান্দি, প্ৰেম কৰি, হিংসা কৰি। শিল্পে কিন্তু আমরা ভাবকেই ধৰিতে চেষ্টা কৰি, তাহাকে সামনে ধৰিয়া দেখি ;

তাহাকে ভাষায় স্বরেতে রেখারঙে বা পাথর কুঁদিয়া প্রকাশ করিতে চাই ; এককথায় তাহাকে মনন করি। এই মনন করিবার সময় আমরা ভাবকে জয় করিয়া নই, ভাবের নিকট হইতে দ্বৰে রহিয়া তাহাকে ভাবি। এইজন্য অভিনয়ে যথন দৃঃখ দেখি তখন মনে মনে দৃঃখের চেয়ে সুখই অধিক অহুভব করি, ভাবাবেগের সুখ পাই ; কারণ দৃঃখ তখন বাস্তবজীবনের দৃঃখ নয় যে আমাদের চালিত করিবে, ইহা তখন কল্পনা-জগতের দৃঃখ। দৃঃখের ভাবটিকে তখন আমরা মনন করিতেছি এবং মননের আনন্দেই অভিভূত হইতেছি, স্মৃতরাঙ় শিল্পকে বাস্তবজগতের অনুকরণ বলা ভুল, বরং শিল্পই বাস্তবজগতের বস্তুগুলিকে নিজরাজ্য লইয়া গিয়া রূপান্তরিত করে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, অনুকরণ কথনও নিখুঁত হইতে পারে না এবং শিল্প সেজন্য বৃথাচেষ্টাও করেন না। শিল্প সর্বদাই কোনো ন্তৃত্ব স্ফটি করিতে চান। তৃতীয়ত, যদি কোথাও অনুকরণও নিখুঁত হয় তাহা হইলে চিত্রকরের আদর করিবে বই বাড়িবে না, কারণ অনুকরণ নিখুঁত হইলে শিল্পবস্তুকে বাস্তববস্তুর সহিত সমান ওজনে তুলনা করা যায় এবং শিল্পীর কারিগরিই প্রশংসার বিষয় হয়, এ ক্ষেত্রে কল্পনা বা ভাবের কোনো কথাই উঠিবে না। এই ধার্মিক কৌশল আলোকচিত্ৰ-শিল্পীর এবং অনেকাংশে আরো প্রশংসনীয় ভাবে ইহা কৃষ্ণনগরের মূর্তিকারদের আছে।

কিন্তু শিল্পস্থিতিতে এই কৌশলের আসন খুব উচ্চে নহে। যথার্থ শিল্পী ইহার জন্য লালায়িত নহেন এবং তিনি কথনও অনুকরণ করিতে চান না। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, যদি অনুকরণ সার্থক হয় আমরা তাহার মধ্যে শিল্পৰস পাইবার বদলে বস্তুটিকে বাস্তববস্তুর মত বিচার করি এবং আমাদের মনে বস্তুটির প্রতিক্রিয়া কার্যকরী ভাবে আনিয়া দেয় ; বল তৈলচিত্র দেখিয়াই আমাদের মনে সাদৃশ্য সম্বন্ধে

ବିଚାର ଜାଗିଯା ଓଠେ, ଛବିଟିର ଭାବନାବିଷ୍ୟ ଆମରା ଭୁଲିଯା ଯାଇ । ଏକ ବିର୍ତ୍ତ୍ୟାତ ଅଭିନେତାର ଦୁର୍ବଲ୍ଲେଖର ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ଦେଖିଯା ବିଜ୍ଞାସାଗର ମହାଶୟ ତାହାର ପ୍ରତି ଚଟିଜୁତା ନିକ୍ଷେପ କରିଯାଇଲେନ, ସେଇ ସମୟ ତାହାର ସଥାର୍ଥ ଶିଳ୍ପ-ମାର୍ଭତ୍ତି ନା ଜାଗିଯା କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ବୃତ୍ତି ଜାଗିଯା ଉଠିଯାଇଲ, ତିନି ଶିଲ୍ପେର ସତ୍ୟକେ ବାନ୍ଧବେର ସତ୍ୟ କ୍ରପେ ଦେଖିଯାଇଲେନ । ଏହିକୁପ ଅରୁଭୂତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହାତେ ନା ସଟେ ମେଇଜ୍‌ନ୍ୟ ଅଭିନୟମଙ୍କ କରା ହୟ ଏବଂ ଛବିତେ ଫ୍ରେମ ଦିଯା ତାହାଦେର ବାନ୍ଧବଜଗତ ହଇତେ ଦୂରେ ରାଖା ହୟ ।

ଏହିକୁପେ ଆମରା ଦେଖିତେଛି ଯେ, ଶିଳ୍ପ ଅରୁକରଣ ନହେ । ତବେ କି ଇହା ବିଶ୍ଵକ ସୃଷ୍ଟି ? ଯେମନ ଶିଶୁ କଲ୍ପନାଯ ନାନାପ୍ରକାର ଖେଳା କରେ, ଛୋଟ ଏକଟି କାଠି ହାତେ ଲାଇଯା କଥନୋ ତଳୋଯାର, କଥନୋ ବନ୍ଦୁକ, କଥନୋ-ବା ଛିପଟି ଏବଂ ଆରଓ କତ-କି ବସ୍ତୁର ଭଦ୍ରିତେ ଲାଇଯା ଘୁରିଯା ବେଡ଼ାୟ—ମେଇକୁପ ଶିଲ୍ପୀଓ କି ଅବାଧ କଲ୍ପନାଯ ଗା ଭାସାଇଯା ଯାହା-ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଯା ଚଲେନ ? ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟେ କିଛୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଛେ ; ଦୁଇଟିଇ ସାଧୀନ କଲ୍ପନାରାଜ୍ୟ ଗଡ଼ିଯା ତୁଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟିକେଇ ମାରୁଧେର ଉଦ୍ବତ୍ତ ଶକ୍ତିର ମଦ୍ୟବହାର ହୟ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଛଟିର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଛେ, କାରଣ ଶିଶୁର କଲ୍ପନାର ଖେଳାର କୋମୋ ଦର୍ଶକ ଥାକେ ନା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅପରକେ ଦେଖାଇବାର ଜୟ ଖେଲେ ନା, ମେଇଜ୍‌ନ୍ୟ ତାହାର ଖେଳାର ମଧ୍ୟେ କୋମୋ ସ୍ଥାଯୀବସ୍ତ ରଚନା କରେ ନା । ଶିଶୁ ତାହାର ଖେଳାକେ ଅପରେର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିତେ ଚାଯ ନା ବା ମେ ସୃହାଓ ତାହାର ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷେ ଶିଲ୍ପେ ଏହି ଭାବଗୁଲିଇ ପରିସ୍ଥିଟ, ଶିଲ୍ପୀର ମନେ ସର୍ବଦାଇ ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକେର ଆସନ ରହିଯାଇଁ । ଶିଲ୍ପୀ କେବଳ ନିଜେର ଅବସର ବା ଭାବ ବିନୋଦନେର ଜୟ ଶିଲ୍ପରଚନା କରେନ ନା ; ଶିଲ୍ପୀ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ଯାହାତେ ଅପରେର ମନେ ଆସନ ପାଇଁ ସର୍ବଦାଇ ତାହାର ଜୟ ବ୍ୟାଗ, ତିନି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅପରେର ସମ୍ମୁଖେ ଧରିଯା ତାହାରଇ ମଧ୍ୟ ଦିଯା କିଛୁ ବଲିତେ ଚାନ ବାହା ଅପରେର ଅରୁଭୂତିତେଓ ଧରା ପଡ଼ିବେ ।

ଶିଳ୍ପୀ ତାଇ ସାର୍ବଭୌମତା ଚାନ ; କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର ଖେଳା ତାହା ଚାଯ ନା, ପାଯ ନା । ଏହିଜୟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଵାଧୀନ ସ୍ଥିତି ହଇଲେଓ ପ୍ରକୃତି ହଇତେ ଏକେବାରେ ଡିନ୍ଦ ହଇତେ ପାରେ ନା । ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଲିପି ନହେ, ଅର୍ଥଚ ପ୍ରକୃତି ହଇତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନହେ । ସ୍ଵତରାଂ ଶିଳ୍ପୀ ଅନୁକରଣ କରେନ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ହଇତେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କରିଯା ତାହାକେ ନିଜେର ଭାବଭାବନା ଦ୍ୱାରା କ୍ରପାନ୍ତରିତ କରିପେ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ସଦି ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରକୃତିର ବିକଳେ ଚଲିତେନ ତାହା । ହଇଲେ ତାହାର ସ୍ଥିତି ଅପରେର ମନେ ଆବେଦନ ଜାଗାଇତ ନା । ଏହିଜୟାଇ ଶିଳ୍ପୀର ନିଜଦ୍ୱ ସ୍ଵାଧୀନ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟେଓ : କିଛୁ ସହଜ ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକୃତି ସକଳେରାଇ ଜାନା ଏବଂ ତାହାକେ ଆଶ୍ରମ କରିଯାଇ ଶିଳ୍ପୀ ଶିଳ୍ପରଚନା କରେନ ଏବଂ ତାହା କରେନ ବଲିଯାଇ ତାହାର ସ୍ଥିତି ଅନାହୁତିତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ନା ।

## ୬. ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ

ଶିଳ୍ପଶ୍ଟି ବା କ୍ରପଶ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ସାଧାରଣତ ଶିଳ୍ପୀକେ ଖୁଜି, ଅର୍ଥାଂ ଆମରା ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନେର ଥବର, ପରିଚନ୍ଦ-ଅପରିଚନ୍ଦ-ମତାମତ ଖୁଜି ତାହାର ସ୍ଥିତେ । କିନ୍ତୁ ଇହା ଭୁଲ । ବଡ଼ ଶିଳ୍ପୀ ତାହାର ଜୀବନେର ଅଭିଜତା ଲୋଖେନ ନା, ତିନି ନୈର୍ଯ୍ୟକ୍ରିକ । ଶେଙ୍କପୀଯରେର ନାଟକ-କବିତା ହଇତେ କବିର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନୋ ଧାରଣା ଥାଡ଼ା କରା ଚାଯ ନା, ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥାହାରା କରିଯାଛେନ ତାହାରା ସକଳେଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହଇଯାଛେନ । କବି ତାହାର କଲନା ଓ "ସହାନୁଭୂତି ଦିଯା ସକଳ ଭାବଭାବନାର ସହିତ ନିଜେକେ ସାମୟିକଭାବେ ଏକାଭୂତ କରେନ ଏବଂ ତାହାର ରଚନାକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବଭାବନା ମନେ କରେନ ନା । ଆପନାର ମଧ୍ୟ ହଇତେ ବିଶ୍ଵଜନୀନ ଅନୁଭୂତିଗୁଲିକେଇ କବି ସର୍ବ-ସାଧାରଣେର ମୟୁଥେ ପ୍ରକାଶ କରେନ ଏବଂ ଏହିଭାବେଇ ସମଟିର କାଛେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସମର୍ପଣ କରିଯା ତିନି ଶିଳ୍ପୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରାଖେନ । ଶିଳ୍ପୀ ଏକଜନ ବିଶେଷ

মানুষ হিসাবে তাহার ধ্যানধারণা লইয়া শিল্পরচনায় প্রবৃত্ত হন না—তিনি মানুষ-জাতির প্রতিনিধি হইয়া বা একটি সচেতন কেন্দ্র হইয়া রচনাকার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই শিল্পস্থিতির আবেদন তাই সকল দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। তাহা বলিয়া শিল্পী তাহার শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করেন না। মনে রাখিতে হইবে, শিল্পীর বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য তাহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; শিল্পীর শিল্পরচনার বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যক্তিগত মতামত বা ধ্যানধারণায় ঝুঁজিলে পাওয়া যাইবে না, এই বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশপ্রণালীর উপর।

এ ক্ষেত্রে একপ প্রশ্ন হইতে পারে— তবে কি শিল্পী অভিনেতার মত মিথ্যা ভান করেন, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত শিল্পীর আন্তরিকতা বা সত্যকার মনের ঘোগ নাই? একভাবে ইহা সত্য। তাহার রচনায় শিল্পী সাময়িক ভাবে কোনো ভাবভাবনার সহিত সহানুভূতি দেখান এবং দর্শক বা শ্রোতারাও তাহাতে ঘোগ দেন। ইহাকে কিন্তু মিথ্যা ভান বলা চলে না, কারণ শিল্পী ও দর্শক উভয়েই জানেন যে, এই ক্ষণিক সহানুভূতি কেবলমাত্র কল্পনায়, বাস্তব ব্যবহারে নহে। কাহারও দৃঃখ্যে যদি আমরা সত্য কাতব না হইয়া মিথ্যা দৃঃখ্যের ভান দেখাই তাহা হইলে আমাদের মিথ্যাচার হইবে। কিন্তু অভিনয় দেখিতে গিয়া যদি একপ সহানুভূতির ভান আমাদের মনে আসে যাহা অভিনেতা ও নাট্যকারও করিতেছেন, তাহাতে আমাদের মিথ্যাচার হয় না। কারণ এখানে সকলেই জানেন যে আমরা ভানই করিতেছি এবং তাহাতেই আনন্দ পাইতেছি; ইহাতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেও বলা হয় না, স্বতরাং ইহাকে প্রতারণা বলা যায় না। এই ক্ষণিক সহানুভূতি বা বিশ্বাসের ভান আপনিই জন্মে। যদি সত্যসত্য বিশ্বাস বা সহানুভূতি দেখা দেয়, যেমন বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা নিষ্পেপ করার

বেলা দেখা গিয়াছিল তাহা হইলে কিন্তু মৌনব্যবোধ নষ্ট হইয়া যায়, কার্যকরী বুদ্ধি বা বাস্তবচেতনা জাগ্রত হইয়া কল্পনারাজ্যকে এক পলকে লুপ্ত করে। এইরূপ ক্ষণিক অর্ধবিশ্বাস গড়িয়া তুলিতে হইলে শিল্পীকে তাঁহার ভাবগুলি বুদ্ধি দিয়া সংযত রাখিতে হয়। ভাবগুলি যদি শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত নিজস্ব হয় তাহা হইলে তাহাদের বাস্তবতা ও তীব্রতা এত অধিক হইতে পারে যে শিল্পী তাহাদের মনন করিতে সমর্থ নাও হইতে পারেন, বরং তাহাদের দ্বারা চালিত হইয়া ভাবের বচ্ছাই শুধু আনিতে পারেন। এইরূপ শিল্পস্থিতি সার্থক হয় না, ইহাতে কেবলমাত্র বেগই পাওয়া যায়, স্থিতি বা সামঞ্জস্য থাকে না। বড় শিল্পীরা তাঁহাদের রচনায় এই অসংযম হইতে মুক্ত, কোনো ভাবকেই তাঁহারা নিজস্ব অনুভূতির গঙ্গির মধ্যে আবক্ষ রাখেন না এবং কোনো আবেগকে প্রশংস্য দিয়া বড় করিয়া দেখান না। সকল ভাবকেই তাঁহাদের শিল্পের সামগ্ৰী হিসাবে ব্যবহার করেন এবং সেগুলিকে মনন এবং প্রকাশ করিয়াই আনন্দ পান, বাস্তব রূপে উপভোগ করেন না। এইভাবে শিল্পী যদি নিজস্ব তীব্রতা অনুভূতি-গুলিকে বাদ দিয়া অপরাপর ভাবের সহিত কল্পনায় মুক্ত হইয়া তাহাদের মনন ও প্রকাশ করেন তাহা হইলে তাঁহার ফল-আৱারও মহৎ এবং সুন্দর হয়। স্বতরাং শিল্পী নৈব্যক্তিক হইলেই শিল্পের লাভ।

### ৭০. শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্ৰেৱণাৰ স্থান

শিল্পে বিচারবুদ্ধি ও প্ৰেৱণাৰ স্থান নিৰ্ণয় সম্বন্ধে শিল্পীদের মধ্যে ও মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ প্ৰেৱণায় বিশ্বাসী; তাঁহারা বলেন যে প্ৰেৱণা বিহাতেৰ বৃলকেৰ মত আসিয়াই চলিয়া যায়, তাঁহার উপৰ বিচারবুদ্ধিৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই এবং বিচারবুদ্ধিৰ উপস্থিতি শিল্পেৰ

ক্ষীতিই করে। গ্রীক দার্শনিক প্রেটো ও ইংরেজ কবি শেলী এই মতে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে ইংরেজ কবিদ্বয় ওয়ার্ডস্যুয়ার্থ ও কোলরিজ মনে করেন যে, কবির বিচারবৃক্ষি তাহার শিল্পসাধনার সহায়ক এবং ভাব সকলকে মনন করিতে বিচারবৃক্ষির প্রয়োজন আছে।

যে ক্ষেত্রে শিল্পীরা নিজেরাই এ বিষয়ে একমত নহেন সে ক্ষেত্রে আমাদের অধিক বলিবার কিছু নাই। তবু মনে হয় আমরা একটি মধ্যপথ ধরিতে পারি অর্থাৎ আমরা মানিয়া লইব যে শিল্পসাধনায় প্রেরণা এবং বিচারবৃক্ষি ছইয়েরই প্রয়োজন। যাহাকে প্রেরণা বলা হয় তাহা কোনো ভৌতিক ব্যাপার নহে; মনে হয়, বহুকালের চিন্তা ও ভাবরাশি ইহার পিছনে থাকে। কোনো-এক মুহূর্তে চৈতন্য হঠাৎ সজ্ঞাগ হইলে অতিক্রম এইসকল চিন্তা ও ভাবরাশির সারবস্তি প্রকাশ-লাভ করে, যেমন কোনো-এক সন্ধ্যায় জুইফুলের কুঁড়িটি হঠাৎ বিকশিত হইয়া ওঠে। শিল্পীর একাগ্রতার চাপে তাহার মনের অনেক কথাই, যাহা সাধারণত মনের অবচেতন স্তরে রূপ থাকে, হঠাৎ আত্ম-প্রকাশ করে। এইসকল ভাবভাবনার ফললাভ কোনো-একটি শুভক্ষণের প্রেরণার উপরেই কেবলমাত্র নির্ভর করে না, শিল্পীর দীর্ঘকালের সাধনা ও ইহার অনেকাংশে সহায়। প্রেরণার তীব্রবেগে শিল্পীর শৃষ্টি অর্ধমুণ্ঠ চিন্তা ও আবেগরাশিকে তাড়া দিয়া বাহির করা চাই, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে বিচারবৃক্ষি ও প্রয়োজন। ইংরেজ কবি কৌটস এই দুই বস্তুকেই মানিয়া লইয়াছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে প্রেরণা স্থিতি অবাধ উৎস খুলিয়া দেয় এবং বিচারবৃক্ষি সেই স্থিতিকে সংহত করে। গতির সহিত স্থৈর্যের বোগ না ঘটিলে শিল্প সার্থক হয় না, স্তুতরাঙ্গ প্রেরণা ও বিচারবৃক্ষি উভয়েরই স্থান শিল্পে স্বীকার্য।

## ৮. শিল্পের সার্থকতা ও আনন্দদান

আমাদের জীবনে শিল্পের সার্থকতা কি, একটি প্রশ্ন হইতে পারে। এই কথার উত্তরে প্রথমেই মনে হয়, শিল্প আমাদের আনন্দ দেয়; আমরা নৃত্য গান চিত্র ভাস্তর্য দেখিয়া শুনিয়া বা পড়িয়া আনন্দ পাই। কিন্তু এই উত্তর ঠিক নহে, কারণ স্বথের জন্য যদি শিল্পচর্চা করি তাহা হইলে এই স্বথ বা আনন্দ অন্য-সকল স্বথ হইতে ভিন্ন, তাহা কিরূপে বলিব। খাত্বস্ত-আস্তাদনের স্বথ হইতে শিল্পরস-উপভোগের আনন্দ কি ভিন্ন নহে? যদি ধৰা যায় যে, শিল্পের আনন্দ বলিয়া একটি বিশেষ প্রকারের স্বথ আছে তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না, কেবল একই কথা ঘুরাইয়া বলা হইল। আমাদের যদি বলিতে হয় যে, শিল্পের আনন্দ বলিয়া কোনো বিশেষ প্রকারের স্বথ নাই, সকল স্বথই স্বথ, তাহাদের জাতিভেদ করা চলে না তাহা হইলে কিন্তু শিল্পস্ত খাত্বস্তর গোষ্ঠীতে পড়িয়া যায়— যাহা আমরা কোনোমতেই ভাবিতে পারি না।

এখন এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই কথাই আমাদের বিচার্য যে, শিল্পের সত্য সার্থকতা আমাদের জীবনে কোনখানে? দেখা যায়, মাঝুষের দৈহিক মানসিক সমস্ত স্বাধীন ক্রিয়াই তাহাকে আনন্দ দেয়, স্ফুরণ আনন্দদানে শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা সার্থকতা নহে অর্থাৎ শিল্পের সার্থকতা স্বথদানে নিহিত নহে। প্রত্যেক স্বাধীন ক্রিয়ার একটি-না-একটি সার্থকতা আছে এবং স্বথ সন্তোষ বা আনন্দ সকল স্বম্পন্ন ক্রিয়ারই শেষে ফলস্বরূপ আসে। এই স্বথ তঃপ্তি বা আনন্দ কোনো-একটি বিশেষ ক্রিয়ার ফলমাত্র নহে বা আমাদের দৈহিক এবং মানসিক ক্রিয়া গুলির মধ্যে কোনো বিশেষ একটিকে শুধু স্বথ-উৎপাদনকারী বলা চলে না, বরং যে-কোনো ক্রিয়াই স্বম্পন্ন হইলে তাহার ফলস্বরূপ আনন্দ

দেখি দেয়। স্বতরাং শিল্প স্বীকৃত দেয় কথাটি সত্য হইলেও শিল্পকে উহার দ্বারা অপর সকল ক্রিয়ার সহিত—যেমন ভক্তি ভালোবাসা অধ্যয়ন ক্রীড়া—মিশাইয়া ফেলিতে পারিব না। শিল্পের নিশ্চয় কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যাহার দ্বারা সে অপর ক্রিয়াগুলি হইতে স্বতন্ত্র। যেমন হাত পা চোখ মুখ সকল অঙ্গেরই বিশেষ বিশেষ সার্থকতা বা ধর্ম আছে এবং তাহা হইতেই ঐ অঙ্গগুলির বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি বা স্বত্ত্বাব বোঝা যায়। সেইরূপ শিল্পচর্চা, অধ্যয়ন, ক্রীড়া ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ সার্থকতা আছে, যেগুলিকে না জানিতে পারিলে আমরা তাহাদের প্রত্যেককে অপর হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারিব না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে, স্বীকৃত বা আনন্দ দানে শিল্পের সার্থকতা বলিলে কোনো লাভ হয় না। কারণ শিল্পের প্রকৃত সার্থকতা কেবলমাত্র আনন্দদানে নিহিত নহে।

### ৯. শিল্পের সার্থকতা ও শিক্ষাদান

যাহারা আনন্দলাভের জন্য শিল্পচর্চা করেন না তাহারা বলেন, শিক্ষাদানের জন্য শিল্পরচনা করা হয় অর্থাৎ শিক্ষাদানেই শিল্পের সার্থকতা। একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব এই মতও ঠিক নহে। পূর্বেই আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি, শিল্পের বিষয়বস্তুকে তাহার আধাৰ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখ্যু ভুল, উহাদের সমস্ক প্রাণের সহিত জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই অচ্ছেত। এখন যাহারা শিল্পকে শিক্ষাদানের উপায় মনে করেন তাহারা শিল্পের বিষয়বস্তুর উপরেই জোর দেন এবং উহা দ্বারাই শিল্পের মূল্যবিচার করেন, কারণ শিল্পের আধাৰ কোনো শিক্ষা বহন কৰিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নীতি-কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়াই কবি শিক্ষাদান করেন, ছন্দ

মিল প্রভৃতির মধ্য দিয়া নহে; স্বতরাং শিল্পকে যদি শিক্ষাদানের উপায় মনে করা হয় তাহা হইলে তাহার অর্থকেই মুখ্য বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু ইহা যে ভুল মীমাংসা তাহা আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যদি শিল্পের সার্থকতা শিক্ষাদানেই হয় তাহা হইলে শিল্পকে বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করা যায় না। কিন্তু আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, শিল্পসাধনা একটি স্বতন্ত্র জিনিস বা বিশেষ ক্রিয়া এবং ইহার কোনো বিশেষ সার্থকতা বা ধর্ম আছে। যদি শিক্ষাদানকে শিল্পের ধর্ম মনে করি তাহা হইলে সমস্যা আরও জটিল হইয়া ওঠে কারণ শিল্পের আবেদন সার্বভৌম এবং দেশকালের গণিমূক্ত। কিন্তু শিক্ষার আবেদন সেক্রপ হয় না। ভারতের যে শিক্ষা বা আদর্শ ভারতের শিল্পে প্রকাশিত, তাহা আবরবে বা ইউরোপে চলে না। প্রত্যেক কবি বা শিল্পীরই জীবন-দর্শন ভিন্ন ভিন্ন, অথচ আমরা দেখি শিল্পস্থষ্টি যেখানে সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে সেখানে আদর্শের বা মতের পার্থক্য শিল্পসংগ্রহণের বাধা হয় না; সকল জাতি, সকল দেশের মাঝেই তাহার আদর করে, এবং সেই শিল্পের রসায়নদনের সময় শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্তুর উপর আমরা জোর দিই না। যদি কোনো কবির কবিতায় শিক্ষাদানই মুখ্য হয় তাহা হইলে সেই কবিতা সার্থক শিল্প হইবে না এবং তাহার আবেদনও এই মতের অনুসরণকারী অন্যসংখ্যক মাঝেই আবক্ষ থাকিবে। স্বতরাং শিক্ষাদান শিল্পের ধর্ম নহে বলা চলে।

কিন্তু শিল্প কুশিক্ষা প্রচার করে, ইহা মনে করা ভুল। বড় শিল্প সর্বদাই সুশিক্ষা দান করে, যদিও শিক্ষাদান করা তাহার কাজ নহে। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বড় শিল্পে ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহাদের মনন করা হয়। এই মননের ফলে ভাবগুলি সম্বন্ধে আমাদের

স্বচ্ছ ধারণা জয়ে, আমরা সেগুলির প্রকৃতি জানিয়া সেগুলিকে জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি।

যদিও শিল্পে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ভাবাবেগকে জয় করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, তবু পরোক্ষভাবে শিল্প আমাদের তাহাই শিখায় এবং এইজন্য শিল্পকে নীতিমূলক না বলিয়া নীতিসহায়ক বলা যায়।

## ১০. শিল্পের সার্থকতা প্রকাশকার্য

বহু বিচারের পর এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারিযে, শিল্পের কাজ স্থিৎ বা শিক্ষা দেওয়া নহে। তবে ইহার কাজ বা সার্থকতা কি? এই সমস্তার সন্তোষজনক মীমাংসা এই যে, শিল্প আমাদের ভাবগুলিকে প্রকাশ করে বা ভাষা দেয়। যেমন ক্ষুধা পাইলে আমরা আমরা থাই বা কোতুহল হইলে বিষয়টিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ কোনো ভাব বা আবেগের অহুভূতি জাগিলে আমরা তাহা প্রকাশ করিবার জন্য চঞ্চল হই এবং প্রকাশ করিতে পারিলেই সেই চঞ্চলতার বেদনা হইতে মুক্তি পাই। এই মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহাই শিল্পচর্চার ফল। কিন্তু যেহেতু আনন্দ প্রত্যেক স্বসম্পন্ন ক্রিয়ারই ফলস্বরূপ সেইজন্য আনন্দকে শিল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য বা সার্থকতা বলা যায় না। শিল্পের বিশেষ সার্থকতা তাহাই তাহার ভাব-বাঞ্ছনায়। প্রকাশের ব্যাকুলতা আমরা সকলেই অহুভব করি, দৃঢ়-স্থিৎ প্রেম-স্থিৎ এইসব ভাবগুলি যখন আমাদের অস্ত্রিত করে তখন আমরা বেদনা পাই। এই বেদনা হইতে মুক্তি দিতে পারে আমাদের ভাষা বা প্রকাশশক্তি। কবি তাই কবিতা লেখেন এবং সেই কবিতা যখন পাঠক পড়েন তখন তাহার মনেও ভাব জাগে। এইভাবে সেই ভাবের প্রকাশও সঙ্গেসঙ্গে হইতে থাকে, তাই পাঠকও আনন্দ পান। যেমন

কবিতাতে ভাব অভিব্যক্ত হয় ভাষার দ্বারা সেইরূপ চিত্রে ভাব প্রকাশ পায় রেখা ও রঙে, ভাস্তর্যে পাথরের উপর খোদাই-কার্যের বিচ্ছিন্ন কৌশলে, সংগীতে শব্দ ও স্বরে, এবং নৃত্যে ভাব অভিব্যক্ত হয় দেহভঙ্গি দ্বারা। এই প্রকাশ বখন নির্মুক্ত হয় আনন্দও তথন পরিপূর্ণ হয় এবং তথনই আমরা শিল্পকে সার্থক ও সুন্দর বলি। সৌন্দর্য এই পূর্ণপ্রকাশ ব্যতৌত আর কিছু নহে। শিল্পে আমাদের ভাবের যেমন প্রকাশ দেখি, প্রকৃতিতেও কোনো কোনো সময় এক-একটি ভাবের সেইরূপ অভিব্যক্তি হইতে দেখি, এবং দেখি বলিয়াই প্রকৃতিকে সুন্দর মনে হয়। যাহার নিজের মনে ভাব নাই সে কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিলেও আনন্দ পাইবে না। তাহার কাছে পাহাড়ের চূড়া আর সবুজ উপত্যকা, ক্ষিপ্রগতি নিবারিণী বা ঘন পাইন-বনের সারি সবই সমান, এবং তাহার চোখে সবই অর্থহীন ও মৃক। শিল্পীর চোখে প্রকৃতির রূপে যত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে তাহা সবই শিল্পীর ভাবজগতেই থাকে; শিল্পী শুধু প্রকৃতিতে তাহার প্রকাশ দেখিতে পান এবং প্রকাশ হইতে দেখিবার সঙ্গেসঙ্গেই ভাবগুলি সহকে শিল্পী সচেতন হইয়া ওঠেন, বাহিরের বৈচিত্র্যে তাহার অন্তর্জগতের বৈচিত্র্যের সন্ধান আনিয়া দেয়। স্বতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শিল্পে প্রকৃতিতে মাঝবের ভাববুশির প্রকাশ হয় ইহাই শিল্পের সার্থকতা। এবং শিল্প ও প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের বৃহস্পতি।

### ১১. ভাবের আদানপ্রদান

এর পরে আমাদের আর-একটি সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে। শিল্পী তাহার ভাবের প্রকাশ করেন কথার ভাষায় বা রেখারঙ্গের ভাষায়, কিংবা অপর কোনো শিল্পের ভাষায়। যে ভাবগুলি শিল্পী

প্রকাশ করিতেছেন তাহা তাঁহারই, তবু তাহা কেমন করিয়া পাঠক বা দর্শকের মনেও আবেদন জাগায় ? অর্থাৎ এখানে আমাদের বিচার করিতে হইবে যে, শিল্পী ও দর্শক বা পাঠকের মধ্যে কিভাবে ঘোগ স্থাপিত হয় ।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, এই ঘোগ যদি স্থাপিত না হয় তাহা হইলে শিল্পীর প্রকাশকার্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, কারণ প্রকাশের অর্থই অপরের কাছে প্রকাশ । প্রকাশ শুধু নিজের কাছে হইলে আনন্দও পাওয়া যাইত না, স্বতরাং এই ঘোগস্থাপন যাহাতে সম্ভব হয় মেইজন্ত শিল্পীকে বিশ্বজনীন ভাবগুলিকেই শিল্পরচনার সামগ্ৰী হিসাবে গ্ৰহণ করিতে হইবে । যে ভাবাবেগ বা অনুভূতিগুলি একান্তভাবে ব্যক্তিগত তাহার মূল্য শিল্পে অধিক হইতে পারে না বৰং উহা মনস্তত্ত্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইতে পারে । তাঁহার শিল্পরচনায় শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ করিতেছেন তাহা তিনি সাময়িকভাবে অনুভব কৰিলেও শিল্পীকে নৈর্যক্তিক রহিতে হইবে ; কারণ সার্বভৌম ভাবগুলিই শিল্পীর ব্যঙ্গনার বিষয় । এ কথা আমরা পূৰ্বেই আলোচনা কৰিয়া দেখিয়াছি । ইহা দেখা যায় যে, শিল্পের সার বিষয়বস্তু সকল কালে সকল দেশেই কংকেট মূল মানব-হৃদয়াবেগ ব্যৱৃত্তি আৱ কিছু হয় না । মেই একই প্ৰেম-ঘৃণা ভয়-হিংসা অপত্য-স্নেহ ও দীৰ্ঘৰভক্তি এবং অপৰ দুই-একটি ভাবকে লইয়াই সব কবিতা সব ছবি<sup>১</sup> ও সব ভাস্কৰ্য এবং সুন্দরের স্ফুটি হয় ।

কিন্তু একপ প্ৰশ্নও হইতে পারে যে, তাহা হইলে শিল্পে এত মৌলিকতা কোথা হইতে আসে ? শিল্পের মৌলিকতা তাহার বিষয়বস্তুকে আশ্রয় কৰিয়া নহে, উহা তাহার প্রকাশভঙ্গিৰ উপর নিৰ্ভৰ কৰে ।

এই প্রকাশভঙ্গি কথনোই এই ভাবগুলিকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিবার মত পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। স্বতরাং প্রত্যেক শিল্পীই এই চিরপুরাতন ভাবগুলিকেই প্রকাশভঙ্গি দ্বারা নব নব রূপ দেন। মানবহৃদয়ের চিরস্তন ভাবগুলির আদি-অস্ত কাহারও সম্পূর্ণ গোচরীভূত হইতে পারে না। শিল্প স্পষ্টভাবে দুই-একটি কথাই বলে এবং আভাসে অনেক কথা বলে। শিল্পের অর্থ বা বিষয়বস্তুও তাই খুব গভীর মনে হয়। মনস্তত্ত্বে যাহাকে হিংসা বলি তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আরও দুই-একটি অঙ্গ দেখিব। কিন্তু কাব্যে এই হিংসারই অন্তরকম আরও গভীর বৈচিত্র্যময় রূপ দেখিব, কারণ কবি যাহা স্পষ্ট বলেন না তাহা আভাসে অনেক বেশি করিয়া বলেন। এই আভাসের ব্যঞ্জনা শিল্পকে গভীর করে এবং প্রত্যেক মৌলিক রচনায় এই ব্যঞ্জনা নব নব রূপে প্রকাশিত হয়।

স্বতরাং দেখিতে পাই যে, প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ যখন শিল্পীর চৈতন্যে সমাজ-মনের ভাবগুলি যাতায়াত করে। শিল্পীকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না, কারণ তাহাকে সমস্ত সমাজ-মনের কেন্দ্র হইয়া সামাজিক ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। সবাকার সহিত শিল্পীর ঘোগ থাকা প্রয়োজন ; নচেৎ শিল্পী সবার হইয়া ভাবপ্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং তাহার প্রকাশকার্যও ব্যর্থ হইবে। প্রকাশকার্য সকল করিবার জন্য শিল্পীকে সামাজিক হইতে হইবে ; কারণ প্রকাশকার্যের মধ্য দিয়াই শিল্পী সমাজের সহিত জড়িত হন এবং পাঠক বা দর্শকেরাও পরম্পরের সহিত সহানুভূতি দ্বারা ক্ষণকালের জন্যও একতা বোধ করেন। যখন আমরা অনেকে মিলিয়া কোনো নাটক বা ছবির প্রশংসা করি তখন ‘সকলেই’ একটি মিলনস্থলে আবক্ষ হই, এবং মেই স্বৃতি নাট্যকার বা চিত্রকরকেও আমাদের সঙ্গে এক করে।

আমরা দেখিতেছি, কতকগুলি বিশ্বজনীন ভাবের উপর শিল্পের ব্যাপক আবেদন নির্ভর করে, কিন্তু ইহার জন্য প্রকাশপ্রণালীকেও সকলের বুঝিবার উপযুক্ত করা প্রয়োজন। দেখা যায়, কতকগুলি সংকেত বা প্রতীকের বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, যেমন কোনো-একটি ভাষার শব্দগুলির নানা রকম অর্থ আছে, বাংলা ভাষায় পাত্র বলিলে একটি বিশেষ বস্তুকে বোঝায়, আবার তৈল বলিলে অপর-একটি বস্তুকে বোঝায়। মেইরূপ বিভিন্ন রেখার বিভিন্ন রকমের অর্থ— ইহা ভাষার ন্যায় সুস্পষ্ট না হইলেও ভাবের প্রকাশ করে। যেমন সকল বাকাচোরা রেখা শক্ত সোজা রেখা হইতে ভিন্ন এবং ছুটি রেখাই পৃথক পৃথক ভাব জাগায় ও প্রকাশ করে। মেইরূপ বঙ্গের স্বরের ও দেহভঙ্গির বেলাতেও একই কথা। এই সংকেতগুলির অধিকাংশই সকলের বোধগম্য, স্তরাং ভাব ফুটাইয়া তোলা এইগুলিরই স্থূল প্রকাশের উপর নির্ভর করে। কেন-যে একটি বিশেষ শব্দ বা রেখারঙ মেই একটি বিশেষ অর্থই বোঝায় তাহা বলা যায় না। কেন কলম শব্দটি একটি পাত্রকেই বোঝায় কোনো ফুল-ফলকে নহে এবং ঘোড়া শব্দটি উচ্চারণ করিলে কেন একটি বিশেষ চতুর্পদ জন্মকেই বোঝায়— এসব আমাদের জানা নেই। এই সংকেতগুলি কখন কেমন ভাবে মানবসমাজ প্রথম গ্রহণ করিল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু সংকেত ব্যবহারের এই সাধারণ বৌতি এবং শব্দগুলির চলতি অর্থ সমাজে আছে বলিয়াই প্রকাশকার্য সম্ভব হয়। এবং এই উপারেই সুন্দরের স্ফটি ও সন্তু হয় এবং শিল্পী তাহার শিল্পস্থিতি দিয়া সমাজের সহিত ভাবালাপ করেন।

## ১২. সৌন্দর্যের স্বরূপ

মৌন্দর্য কোনো বস্তুতে তাহার রং বা আকারের মত লাগিয়া থাকে না। বস্তুর ভাবলাবণ্য অভ্যবের ধারা সৌন্দর্যকে আমরা পাই এবং



ইহা প্রকাশ-ক্রিয়ার উপলক্ষি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যখন একটি ইন্স্ট্রুমেন্ট কয়েকটি সাধারণবোধ সংকেত দ্বারা আমাদের কোনো হৃদয়বৃত্তিকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করে তখন আমরা মেই বস্তুকে সুন্দর বলি। অথচ মে সময় সৌন্দর্যের অবস্থান সম্পর্কে আমরা যে সচেতন থাকি তাহা নহে, সৌন্দর্যের অভ্যন্তরিক বস্তুটির সুন্দর প্রকাশে অথবা আমাদের মধ্য হইতেই পাই, তাহা ভাবি না। আমাদের সুন্দর লাগাকে আমরা বস্তুটির উপর আরোপ করি এবং বস্তুটিকেই সুন্দর মনে করি। আমাদের মনের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের চোখে দৃশ্যমান নহে; তাহা যদি হইত তাহা আমাদের সৌন্দর্যেপলক্ষিতে বাধা উপস্থিত করিত। যেমন আমরা রজ্জুকে ভ্রম করিয়া সর্প দেখি এবং তখন বুঝিতে পারি না এই অভ্যন্তরিক আমাদের মনেই রহিয়াছে, বাহিরে নহে; সেইরূপ একভাবে সৌন্দর্যকেও একটি ভ্রম বা মায়া বলা যায়। কিন্তু ঘেরে তু এই মায়া চিরস্মৃত এবং বিশ্বজনীন (ক্ষণস্থায়ী নহে), স্বতরাং ইহাকে একুপ ছেটিভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, বরং সুন্দরকে সত্যেরই সমান মূল্য দেওয়া যায়। সত্য শিব অর্থাৎ মঙ্গল এবং সুন্দর— এই তিনটি মানব-জীবনের পরম আদর্শ; ইহাদের মধ্য দিয়াই বিশ্বদেবতাকে মানুষ দেখে। বিশ্ব-ষষ্ঠিকার যে সুন্দরকে আমাদের সম্মুখে তাঁহার স্থষ্টি প্রকৃতির লীলায় মেলিয়া ধরিয়াছেন শিল্পী তাহাকেই নিজের রচনায় ধরিয়া রাখিতে চাহেন। আমাদের প্রাবিত করিয়া সুন্দরের লীলা এই অনন্ত প্রাণপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে, আনন্দের প্রোত বহিতেছে। এই সৌন্দর্যপ্রকাশের আনন্দে আমরা আত্মহারা হইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের আরও আনন্দ আছে। আমরা সত্যাহৃসরণ করিয়া বা ধর্মসাধনা করিয়া আনন্দ পাই এবং কর্তব্যকর্ম করিয়াও আনন্দ পাই। স্বতরাং আমরা সর্বদাই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি না বা শিল্পচর্চা।

করিয়া জীবন কাটাই না। শুধু ভাবপ্রবণতায় মানুষের প্রকৃতিতে শৈথিল্য আসে। মানুষের চরিত্রে স্মৃতি-বীৰ্য ও জ্ঞান-ধর্মেরও প্রয়োজন। এই সমস্ত রকম গুণের সমন্বয়েই এবং ঈশ্বরদত্ত সর্বপ্রকার আনন্দের স্বষ্টি সামঞ্জস্যে মানবজীবন সার্থক সুন্দর হয়। ইহার পরিচয় আমরা বৈজ্ঞানিকের জীবনে দেখিতে পাই।

### ১৩. মহান् সৌন্দর্য ও কুশ্চিতা

প্রকৃতির বিরাট বা ভয়াল রূপ দেখিলে সৌন্দর্যাভূতি না হইয়া প্রথমে অনেক সময় আমাদের মনে ভয় ও বিরাগের সংকাৰ হয়; কিন্তু পরমুহুর্তেই মনে একটি মহিম সৌন্দর্যের<sup>২</sup> অভূতি জাগিয়া ওঠে এবং তাহাতে আমরা অভিভূত হই। আকাশচূম্বী দিগন্তবিলম্বিত পর্বতশ্রেণী বা সীমাহীন গর্জনময় বিক্ষুক সমুদ্র কিংবা গভীর বাত্রের সুন্দর আকাশে অসংখ্য তারাদল দেখিয়া আমাদের মনে এই মহিম সৌন্দর্যের অভূতি জাগিয়া ওঠে। এই ভাষটিকে সৌন্দর্যের অভূতি হইতে অনেকে পৃথক করিয়া দেখেন। ইহা কিন্তু ভুল। সৌন্দর্যের আনন্দভাব ও সৌন্দর্যের মহান্ ভাবের মধ্যে কেবলমাত্র পরিমাণের প্রভেদ— গুণের নহে। মহান् সৌন্দর্যকে কঠিন সুন্দর বলা যায়, অর্থাৎ ইহা মেই শ্রেণীর সুন্দর যাহা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর মনে করা কঠিন, কিন্তু কিছু পরেই অতি সুন্দর বলিয়া বোঝা যায়। একভাবে ইহাকে সৌন্দর্যের দুরহ ভাবও বলা যায়। প্রই যে অসুন্দর মনে হওয়া—

২ ইংরেজিতে ইহাকে sublime বলে। বাংলায় এমন কোনো একটি শব্দ প্রচলিত নাই যাহা ইহাকে প্রকাশ করে। পশ্চিমোহন সেন মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে ‘বিরাট’ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা যায়। অথবেদে এইরূপ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহার কারণ এই যে, প্রকৃতির বিরাট বা ভৌষণ ক্লপগুলিতে আমরা প্রথম কোনো ভাবের প্রকাশ দেখি না, তার পরে তাহাতে আমরা মানবাত্মার মহত্ব এবং মৃত্যুর ভৌষণতা ও বিরাটভূতের ভাব (যাহা আমাদের সবার অন্তরেই থাকে) প্রকাশিত দেখি। এইখানে আমরা অসুন্দর কি, তাহারও বিচার করিতে পারি। অসুন্দরের বোধ তখনই আসে যখন কোনো সংকেত— যেমন শব্দ বেখা বং ইত্যাদি কোনো-একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হয়। কোনো কুৎসিত মুখ বদি ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে চাই এবং ঠিক ভাবে মুখটির ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ছবিটি সুন্দর : অন্যথা ছবিটিতে বদি সেই মুখের যথার্থ ভাবটি না ফুটাইয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে সমস্ত ছবিটিই অসুন্দর ও বিরক্তিকর , হইবে। অস্পষ্ট প্রকাশ বা প্রকাশের অক্ষম চেষ্টাই অসুন্দর।

এইরূপ দেখিতেছি যে, সুন্দর-অসুন্দর ভাবপ্রকাশের সাফল্য-অসাফল্যের উপর নির্ভর করে। যেখানে ভাব নাই এবং প্রকাশও নাই সেখানে সুন্দরও থাকিতে পারে না। যেখানে ভাব আছে অথচ প্রকাশ নাই, সেখানে ভাবকে না জানার জন্য অস্পষ্টতার বেদনা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অস্পষ্টতাই দুঃখ। ভাবপ্রকাশ করিতে গিয়া শিল্পী যখন অকৃতকার্য হয়, শিল্পীর স্থষ্টি যখন খানিক আলো খানিক ছায়ার বিশৃঙ্খল হইয়া মনকে পীড়িত করে তখনই আমরা অসুন্দরকে অনুভব করি।

### ১৪. সত্য সুন্দর ও মঙ্গল

সত্য ও শিব বা মঙ্গলের উপলক্ষ কিভাবে সৌন্দর্যোপলক্ষ হইতে ভিন্ন তাহা জানা প্রয়োজন। সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শ মাঝ্যকে মহনীয় করে এবং মানবজীবনে এই তিনটির মত আর কিছুই মূল্যবান्

মহে এবং সকল বস্তুরই মূল্য এইগুলির মাপকাঠিতে নির্ণয় করা হয়। সত্য শিব ও সুন্দরের মধ্যে ঐক্য আছে, কিন্তু ইহারা এক নহে। কোনো-একটি পারমার্থিক নিত্যবস্তুই সত্য শিব ও সুন্দরের রূপ ধরিয়া মাঝুষের জ্ঞানগোচর হয় এবং এই তিনটি আলোকচিহ্নের নির্দেশ বাহিয়াই মাঝুষ পরমার্থের সক্ষানে বাহির হয়। সত্য সুন্দর ও মঙ্গল— এই তিনটি পথের পরম্পরের মধ্যে ভেদ কোথায় তাহা জানিতে হইবে। সত্যের পথে চলেন জ্ঞানীরা, সুন্দরের পথে চলেন শিল্পীরা এবং সাধক-মহাত্মারা চলেন মঙ্গলের পথ ধরিয়া। সত্যকে অনেক সময় সুন্দর বলা হয়, তখন সত্যকে সুন্দর বলি ভাবের বা উপলক্ষ্মির সত্য হিসাবে; কোনো তথ্য বা তত্ত্বকথার সত্য হইতে এই সত্য তখন ভিন্ন। আমাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিলে আমরা সত্যকে চাই, যখন কোনো বস্তুকে যথাযথভাবে সেটি ঠিক কেমন জানিতে অনুসন্ধিৎসা জাগে তখনই সত্যকে চাই। এই অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হইলে আনন্দ পাই, কিন্তু এই আনন্দ সৌন্দর্যপলক্ষ্মির আনন্দ হইতে ভিন্ন— যদিও আনন্দ মূলতঃ সবই এক, শুধু ভাবে ভিন্ন। যখন সত্যকে চাই তখন কোনো বস্তুর সত্যটি ঠিক কেমন তাহাই জানিতে চাই, এই সত্যটি আমাদের কেমন লাগে এ কথা তখন অবাস্তু। পক্ষান্তরে সুন্দরকে যখন উপলক্ষ্মি করি তখনই আমাদের প্রকাশ-ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে, সৌন্দর্যের এই বিশেষ রূপটি আমাদের কেমন লাগে ও কি ভাব প্রকাশ করে এই কথাই বলিতে চাই, বস্তুটির বাস্তবরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তখন মনে আসে না। এই প্রকাশ-ইচ্ছাটি সফল হইলে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। আরও একটু বিচার করিলেই দেখা যায়, যখন সত্যের সক্ষান করি তখন আমাদের বুদ্ধি প্রত্যেক বস্তু বা তত্ত্বকে তাহার বাস্তবিক আবেষ্টনের মধ্যে যথাযথ ভাবে দেখিতে চায়, এবং সেই বস্তুটির সহিত সংসারের অপরাপর বস্তুর কার্যকারণ-সম্বন্ধ

বিচার করিতে চাই। এইভাবে সমগ্র বস্তুটিকে তখন এক বিরাট স্থিতি  
ব্যাপারের একটি অংশক্রপে দেখি। মৌনদর্ঘের সন্ধান যখন করি তখন  
কিন্তু মন-বস্তুটিকে অন্তরের সহিত মিলাইয়া দেখিতে চাই। তখন  
মৌনদর্ঘের বিশেষ রূপটিকে তাহার বাস্তব আবেষ্টনী হইতে তুলিয়া লইয়া  
একটি স্বতন্ত্র সমগ্র স্থিতি রূপেই দেখিতে চাই। একটি প্রকৃটিত  
পদ্মফুলের বৈজ্ঞানিক বিচার করিলে পদ্ম নামক ফুলটি ফুলগোপ্তার কোন্  
শ্রেণীতে পড়ে, তাহার উৎপত্তি ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা কোন্ কোন্  
বৈশিষ্ট্য তাহার পুস্পজীবনের ইতিহাসে ধরা পড়িয়াছে এইসকল তত্ত্ব  
বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটিত করিবেন। পক্ষান্তরে শিল্পী ফুলটিকে একটি  
স্বরংসম্পূর্ণ স্থিতি রূপে উপলক্ষ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। প্রেম-  
ভাবকে বৈজ্ঞানিক যখন বিচার করিবেন তখন প্রেমকে মানব-হৃদয়বৃত্তি-  
সমূহের একটি বলিয়া ধরিবেন এবং বিশেষণ করিবেন। এইরূপে আমরা  
প্রেমের বিভিন্ন মৌলিক অঙ্গ এবং তাহার উৎপত্তি ও সার্থকতার বাস্তব  
তত্ত্বগুলির বিচার ও গবেষণা করিতে পারি। অপরপক্ষে কবি প্রেমকে  
অন্তর দিয়া উপলক্ষ করিয়া আনন্দ ও মৌনদর্ঘের অনুভূতি দিয়া তাহাকে  
স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ রূপে নিজের বচনার মধ্যে প্রকাশ করিবেন। উপলক্ষ-  
শক্তি সৌন্দর্য-সাধনার বিশেষ সহায়। অনুভূতিই কবিকে মুঝ এবং  
প্রকাশের জন্য আকুল করে।

এই দুইয়ের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত সত্য— বিজ্ঞানের সত্য না ভাবের  
সত্য— ইহার বিচার করিতে যাওয়া ভুল। কারণ এই দুটিকে পাশাপাশি  
রাখিয়া বিচার করিব কি দিয়া? দুইটিই বিভিন্ন স্তরের সত্য; একটি বুদ্ধির,  
অন্তি অনুভূতির। একটিকে দিয়া অন্তির বিচার করা যায় না—  
মাঝের তৃতীয় কোনো জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকিলে তাহার দ্বারা এই দুইটির  
তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হইত। বুদ্ধি অনুভূতির সত্যকে অবজ্ঞা

করে, আবার অনুভূতির উপর ভর করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যকে ছোট করা অনুচিত। বুদ্ধি এবং অনুভূতি উভয়কে একই পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে, কারণ মর্যাদায় কেহ কাহার ও অপেক্ষা ছোট নহে।

মঙ্গলের ভাব তখনই আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় যখন আমাদের মধ্যে সমাজচেতনা আসে এবং আমরা কোনো শুভ-সাধনে প্রবৃত্ত হই। এই শুভ-সাধনাকে একরূপ কার্যকরী বুদ্ধিও বলা যায়, কারণ ইহা আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে। সত্য ও সুন্দরের ক্ষেত্রে কর্মপ্রবৃত্তি নিরুৎসুক থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা শিল্পরচনায় বুদ্ধি ও অনুভূতিই অতি সক্রিয় থাকে। মঙ্গলসাধনের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি তাহার কর্মশক্তিকে জাগাইয়া মন ও আত্মার সহিত দেহকেও সক্রিয় করিয়া নিজের সকল শক্তি একত্র করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

শুভাশুভের ধারণা দেশে দেশে কালে কালে সমাজের অবস্থার অনুযায়ী পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু শুভের সাধনা সকল সময়েই মঙ্গল আনে। মঙ্গলের সাধনা তাই সত্য ও সুন্দরের সাধনার মত নিষ্পৃহ নহে, ইহা কর্মের সাধনা; এবং কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই কোনো-একটি আদর্শে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বাস্তবজগতে ক্রপায়ণ করিবার চেষ্টা আসে, যাহা নিবিকার চিত্তে সন্তুষ্ট নহে। সমাজস্বার্থ ও আত্মোন্নতির সাধনাই মঙ্গলসাধনা এবং সাধক-মহাত্মারা এই মঙ্গলের সাধনা করিয়াই আনন্দ পান। মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁহাদের শুভব্রতে অতী করে। কিমে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ভাঁর লাঘব হইবে সেই কথাই তাঁহারা সর্বদা চিন্তা করেন এবং তাঁহাদের সকল কর্মে মানুষের কল্যাণকেই ফুটাইয়া তুলিতে চান। ভগবানের অবতার রূপে ধাঁহারা আমাদের কাছে পৃজিত তাঁহারা নিজ নিজ জীবনকালে সময়োপযোগী নৃতন পথ বা ধর্মমত আচরণ করিয়া সর্বসাধারণকে তাহা শিখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্ত্য

বুদ্ধ শঙ্কর ও পরমহংসদেব ভারতে মঙ্গলসাধনা করিয়াছিলেন। ইহারা যে-সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন তাহা দর্শন বা বিজ্ঞানের সত্য নহে, তাহা পারমাথিক সত্য; ইহা তাঁহারা মঙ্গলের পথে পাইয়াছিলেন এবং এই সত্যকে কবি পান সুন্দরের পথে চলিয়া ও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পান সত্যের পথে চলিয়া।

### ১৫. কাব্যের সৌন্দর্য

এখন আমরা কয়েকটি বিশেষ শিল্পে সৌন্দর্যস্থিতি কিভাবে হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সৌন্দর্যস্থিতিতে কবির দান অতুলনীয়। প্রথমে কাব্যের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাক। কাব্যে আকরিক শব্দ বা কথা দিয়া ভাবপ্রকাশ করা হয়। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, ভাবপ্রকাশ সার্থক হইলেই সৌন্দর্যস্থিতি হয়। সুতরাং কবিকে কথাশিল্পী বলা যায়, কারণ ছন্দোময় কথার স্থনিবাচিত সমাবেশে তিনি কবিতা রচনা করেন—চিত্রশিল্পী যেমন তাঁহার চিত্রস্থিতি করেন রেখা ও রঙের সুন্দর সমাহারের দ্বারা। সংস্কৃত কাব্যদর্শনে রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্যগুলি এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে সৌন্দর্যরসের উন্নতি হয়। সকল শিল্পের মত কবিতারও বিষয়বস্তু ভাব। শব্দের অর্থ আছে এবং সেই অর্থ দ্বারা বিজ্ঞান ও দর্শনকে বোঝানো যায় অর্থাৎ চিন্তা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত নির্বাচিত শব্দগুলির সাধারণ অভিধানগত অর্থ ছাড়াও আর-একটি ভাবপ্রকাশক অর্থও থাকিবে এবং এই শব্দছন্দের ব্যঙ্গনা বা ইঙ্গিতের উপর ভাবের উদ্দীপনা এবং ভাবপ্রকাশ নির্ভর করে। কবিতার বিষয় চিন্তাপ্রধান নহে এবং যে ক্ষেত্রে কবিতা চিন্তাপ্রধান মেখানে ছন্দ মিল ইত্যাদি যথাযথ হইলেও কবিতা হিসাবে তাঁহার বিশেষ-কোনোও মূল্য থাকে না। কবি তাঁহার

କବିତାଯ ଅନେକ ଚିନ୍ତାର ଅବତାରଣା କରେନ, କିନ୍ତୁ ସେ ମକଳାଇ ତିନି ଗଭୀର ଅହୁଭୂତି ଦିଯା ଦେଖେନ, ନିଛକ ଚିନ୍ତାର ଫଳ ତାହା ନହେ । ଅହୁଭୂତିର ଏହି ତୀବ୍ରତାଇ କବିତାଯ ରମେର ସ୍ଥଷ୍ଟି କରେ, ନହିଁଲେ ନିଛକ ଚିନ୍ତାର ଭାବକେ ଛନ୍ଦ ବା ସ୍ଵର ଦିଲେଓ ଉହା ଆମାଦେର ମନେ ଆସନ ପାଇ ନା । ଛନ୍ଦ, ମିଳ, ଅନଂକାର ପ୍ରଭୃତିର ସାହାଯ୍ୟ କାବ୍ୟେ ଭାବ ଫୁଟୋଇବାର ଜନ୍ମାଇ ଆବଶ୍ୟକ । ସଥନ କୋନୋ ହୃଦୟାବେଗ ଆମାଦେର ଚକ୍ରଳ କରେ ତଥନ ଆମାଦେର କଥା-ବାର୍ତ୍ତାତେও ଏକଟୁ ସ୍ଵର ଆସିଯା ଲାଗେ । ସେ ସମୟ ଆମରା ଠିକ ସାଭାବିକ ଗଢ଼ିଛନ୍ଦେ କଥା କହିତେ ପାରି ନା । କାବ୍ୟେ ତାଇ ଦର୍ଶନତତ୍ତ୍ଵ ବା ନୌତିତତ୍ତ୍ଵ ଓ କବିର ଆହୁଭୂତିର ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗିତ ହଇଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଦର୍ଶନେ ସଥନ ‘ଅସୀମ’ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରି ତଥନ ଆମାଦେର ଚୋଥେର ସମ୍ମୁଖେ କୋନୋ ଛବି ଫୁଟେ ନା କିଂବା ମନେ କୋନୋ ଭାବ ଜାଗେ ନା, ତଥନ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦିଯା ରୂପରୂପଶହୀନ ‘ଅସୀମ’ ଶବ୍ଦଟିର ସଂଜ୍ଞା ମାତ୍ର ବୁଝି । କିନ୍ତୁ କବିତାଯ ‘ଅସୀମ’ କଥାଟିର ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରଥମେଇ ଆମାଦେର ହୃଦୟକେ ଦୋଳା ଦେଇ, ଆମରା ଯେନ ଦୂରଦିଗ୍ନତକେ ଚୋଥେର ସମ୍ମୁଖେ ଭାସିଯା ଉଠିତେ ଦେଖି— ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ନକ୍ଷତ୍ରାଜିର ନୀଚେ ମାତ୍ର ମୂର୍ଦ୍ର ତେବେବୋ ନଦୀ ପାରେର କୋନୋ ଅଦେଖୀ ରୂପକଥାର ରାଜ୍ୟେର ଜନ୍ମ ମନ ଆକୁଳ ହୁଏ । ସୁତରାଂ ଶବ୍ଦେର ମାଧ୍ୟମ ଆଭିଧାନିକ ଗଢ଼ ଅର୍ଥାଇ କାବ୍ୟେ ସବ ନହେ, ଶବ୍ଦେର ସେ ଆବେଗ-ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଛେ ତାହାରାଇ ଅହୁଶୀଳନେର ଫଳ କବିର କବିତା । ଏହିଜୟ କବିକେ ତାହାର କବିତାର ଅକ୍ଷରଗୁଲି ଅହୁଭୂତି ଦିଯା ସାଚାଇ କରିଯା ଚଯନ କରିତେ ହୁଏ । ସୁତରାଂ କବିତାର ଶବ୍ଦଗୁଲିର ଧରନି ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗନାର ମୂଲ୍ୟ ତାହାଦେର ଅର୍ଥେର ଅପେକ୍ଷା କମ ନହେ— ଅଧିକ ହିଁତେ ପାରେ । ଏହିଜୟାଇ କବିତାକେ ଅର୍ଥ ଭାବାଯ ଅହୁବାଦ କରିଲେ ଏମନକି ନିଜସ୍ଵ ଭାବାତେଇ ଗଢ଼ାର୍ଥ କରିଲେ କବିତାର ମୌନଦୟରମ ଅର୍ଥାଂ ତାହାର ପ୍ରକାଶଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହଇଯା ଥାଏ । ଏହି କଥାଗୁଲି ଆମାଦେର ଅହୁଭୂତିରେ

আপনা হইতেই আসে। রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’য় দার্শনিক তত্ত্বাব এবং ‘নৈবেদ্যে’ নীতিতত্ত্বাব দেখা যায়, কিন্তু তবু কবিতা হিসাবে ইহাদের তুলনা পাওয়া যায় না কেন? এই ভালো-নাগা কবিতাগুলি ভাবনার জন্য নহে, ভাবের জন্য। ‘বলাকা’য় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-জীবনের যে ক্ষণিকতাকে কবি দেখাইয়াছেন তাহা বৌদ্ধিক ক্ষণিকবাদের দর্শন নহে। ‘বলাকা’র কবিতার ভাবগুলিকে যদি তাহাদের ছন্দ-মিল-বর্জিত করিয়া খুব দার্শনিক ভাষায় পূর্ণস্থিত করা যায় তাহা হইলে তাহারা সেভাব প্রকাশ করিবে না যাহা কবিতায় হইয়াছে। ‘নৈবেদ্যে’র কবিতা সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। কবি তাহার হস্যাবেগকে প্রকাশ করেন এবং তাহার ভাবানুভূতি যদি কোনো নৈতিক বা দার্শনিক ধারণা অবলম্বন করিয়া জাগ্রত হয় তাহা হইলে ঐ ধারণাগুলিরও তাহার কাব্যরচনায় স্থান থাকিবে, তবে ক্রপান্তরিত ভাবে। দর্শন বা নীতিশাস্ত্রের বিচারপ্রণালী দিয়া তাহাদের মূল্যনির্ণয় করা চলে না। ভাবগুলির সত্যাসত্যের পরিমাপ কবিতায় জ্ঞানবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে হয় না, অনুভূতি বা উপলক্ষ শক্তির তারতম্য অঙ্গসারে হয়। অর্থাৎ কাব্যের সত্যে ও জ্ঞানের সত্যে ভিত্তিগত প্রভেদ আছে।

ভাবপ্রকাশের কয়েকটি সাধারণ রীতি আছে। রচনার মধ্যে ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুই আছে এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্য স্থাপন করাই রচনার উদ্দেশ্য। যে ভাবটিকে প্রকাশ করিতে চাই তাহার নিজস্ব আবেদন থাকিতে পারে, না ও থাকিতে পারে; যেমন প্রেম-ভক্তি আমরা ভালোবাসি কিন্তু হিংসা-কপটতা চাই না। কাব্যে কিন্তু সকল ভাবই স্থান পায়; স্মৃতরাং কাব্যের আবেদন বিষয়বস্তু অপেক্ষা তাহার রচনাভঙ্গির উপরই বেশি নির্ভর করে। ভাবপ্রকাশেই সৌন্দর্যের স্থষ্টি

এবং তাহাতেই আনন্দ ! সুতরাং প্রকাশপক্ষতিটি কবির অরুশীলন করা চাই। অভ্যাস ও অরুশীলন দ্বারা খানিকটা আয়ত্ত করা অসম্ভব নহে, কিন্তু সাধারণত কবিমাত্রেই সহজাত প্রকাশক্ষমতা থাকে। কাব্যপ্রতিভা অসুসারে প্রকাশক্ষমতা বেশি-কম হয়। সার্থক রচনায় সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যেও একটি সংগতি সুন্দরভাবে বিরাজ করে। বিশ্বেষণের ফলে দেখা যায়, রচনায় বৈচিত্র্যস্থিতি এবং ঐক্যস্থাপনের কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে ; সেইগুলির স্থুল সাধনেই সর্বাঙ্গ-সুন্দর রচনার পতন হয়। বৈচিত্র্যস্থিতির মুখ্যউপায় তিনটি— প্রথমত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন। এইটি সার্থক কবিতায় এবং নাটকে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যেমন ‘শা-জাহানে’—

মিথ্যা কথা ! কে বলে যে ভোল নাই ?

কে বলে রে খোল নাই

সৃতির পিঞ্জরদ্বার ?

এইখানে কবিতার প্রথম ভাবগুলির পরিবর্তন হইল, পাঠক বৈচিত্রের আস্বাদ পাইলেন। নাটকে এই বৈচিত্র্য প্রায় প্রতি পট-পরিবর্তনের সঙ্গেই দেখা যায়। বৈচিত্র্যস্থিতির দ্বিতীয় উপায় হইতেছে বৈপরীত্য। দুইটি বিপরীত ভাব যেমন প্রেম ও হিংসা পাশাপাশি রাখিয়া ইহার প্রকাশ হয়। ‘অভিসার’ কবিতায় সন্ধ্যাসী আচীর-তলের ধূলিতে সুপ্ত, সেই সময় ‘যৌবনমদমত্ত’ নগরীর নটীর ন্ম্পুর-শিঞ্জিত চরণ সন্ধ্যাসীর বৃক্কে বাজিল। এইখানে বৈপরীত্যের দৃষ্টান্ত। একদিকে ত্যাগের রূপ, অন্তর্দিকে ভোগের। এই কবিতা হইতেই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন দেখি সেই নটী পুরপরিখার বাহিরে পরিত্যক্ত, তাহার সর্বাঙ্গ মারীগুটিকায় আচ্ছন্ন। তখনই প্রথম ছবির সহিত দ্বিতীয় ছবি মিলাইয়া লইতে মন যায় এবং দারুণ বৈপরীত্যের

আঘাত পাই। কবি অনেক সময় একটি লাইনেই এই বৈপরীত্য ধরিয়া দেন ; যেমন ‘শা-জাহান’ কবিতায়—

একবিন্দু নয়নের জল

কালের কগোলতলে শুভ সমৃজ্জল

এ তাজমহল।

এখানে যেন অনন্তের পটভূমিকায় দেখি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলিন্দু। নাটকে এই বৈপরীত্য পাশাপাশি দুই রকম চরিত্র চিত্রণ দ্বারা হইয়া থাকে— একটি হয়তো সরলচেতা গুথেলো, অগুটি কুটিল ইয়াগো। বৈচিত্র্য-স্থিতির তৃতীয় উপায় ছন্দ। ছন্দ দিয়া ধ্বনিশুলি একটি বিশেষ নিয়মানুসারে মাপ বা তাল রাখিয়া পরিবর্তিত হয়।

এখন ঐক্যস্থাপনের উপায়গুলি আলোচনা করা যাক। প্রথমত বিভিন্ন ভাবের মধ্যে কোনো একটিমাত্র ভাবের উপর জোর দিয়া অর্থাৎ তাহাকে মুখ্যভাবে প্রকাশ করিয়া ঐক্যস্থাপনা করা যায়। যেমন ‘শা-জাহান’ কবিতায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা এবং সম্পূর্ণ ত্যাগের ভাব লইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লওয়াই মুখ্যভাব এবং সেইটিকেই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। অগ্রান্ত ভাবগুলি, যেমন শা-জাহানের প্রেম, ভগ্নপ্রাপ্তদের শৃঙ্খলা ইত্যাদিকে গোণ করা হইয়াছে ; ‘চাণক্য’ নাটকে যেমন প্রতিহিংসার ভাবকেই প্রধান করা হইয়াছে এবং সেই ভাবটিই প্রাণে বেশি করিয়া বাজে। চরিত্রগুলির মধ্যে চাণক্য— যিনি নাটকের নায়ক— চোপের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠেন। ঐক্যস্থাপনের দ্বিতীয় পথ হইতেছে ঐক্তান স্থিতি করা। রচনার মধ্যে এমন-একটি আবহাওয়া স্থিতি করিতে হইবে যাহা দ্বারা সমস্ত বৈচিত্র্যই একটি সংগতিতে মিশে। ইহা শব্দের চরণ এবং ধ্বনিবিভাসের উপর নির্ভর করে। ভূতের গল্পে যেমন আবহাওয়াকে ভূতুড়ে করিয়া দেওয়া হয় এবং

କୋନୋ ସୀରାସେର କାବ୍ୟେ ସେମନ ତଳୋଆରେର ଝଙ୍କାର ଶୋନା ଯାଏ ।  
ଭାରମମତା ଐକ୍ୟଜ୍ଞାପନେର ତୃତୀୟ ଉପାୟ । ଭାବଗୁଲିର ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ତ  
ରାଖିତେ ହଇବେ, ସେମନ ଛବିର ବିସ୍ୟବସ୍ତ୍ର ଦୁଇଦିକେ ଓଜନ ସମାନ ରାଖିତେ  
ହେ ।

ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରଗାନ୍ଧୀତେ କବି ଭାବପ୍ରକାଶେ ସମର୍ଥ ହନ ଏବଂ ଇହାଦେଇ  
ଜୁଣ୍ଡ ସାଧନେ ତାହାର ରଚନାଯ ମୌନଦ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ହେ । କବିତାଯ ଭାଷାର  
ଅଲଂକାରେର ପ୍ରୟୋଜନ ହେ ଭାବକେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଜଣ୍ଠି, ଇହା ମିଥ୍ୟା  
ଆଡ୍ସର ନହେ । ଉପମା ଓ ରୂପକେର ବ୍ୟବହାର ଗତେ ବିଶେଷ ହେ ନା, କାରଣ  
ମେଥାନେ ଅର୍ଥ ଲହିଯାଇ ଆମାଦେଇ କାରିବାର । କାବ୍ୟ ଭାବପ୍ରକାଶେରେଇ  
ସାଧନା, ତାହା ସାଧାରଣ ଆଭିଧାନିକ ଗତେର ଭାଷାଯ ଫୋଟେ ନା; ଛନ୍ଦ  
ମିଳ ଧରନି ବ୍ୟାତୀତ ଅଲଂକାରେର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ହେ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପ  
ଦେଖିଯା ମନେ ଯେ ଭାବ ଆସେ ତାହା କି କୋନୋ ମନ୍ତ୍ରବିଦେର ଭାଷାଯ  
ପାଇବ, ସେମନ ପାଇଯାଛି ଏହି କବିତାଯ—

ନାମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତଙ୍ଗୀଲମା ସୋନାର-ଔଁଚଲ-ଥମା

ହାତେ ଦୀପଶିଖ—

ଦିନେର କମ୍ଲୋଳ-'ପର ଟାନି ଦିଲ ବିଲିଷିର

ଫଳ ସବନିକା ।

ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତିର ଭାବଟୁକୁର ପ୍ରକାଶ ହିୟାଛେ ଉପମାର ସାହାଯ୍ୟ—

କ୍ଲାନ୍ତି ଟାନେ ଅଙ୍ଗ ମମ ପ୍ରିୟାର ମିନତି ଦମ

ଆବାର ଅନାବଶ୍ୱକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଘୋରାଫେରାରୀ ଯେ ଉଦ୍ଦାସ ବୈରାଗ୍ୟେର ଭାବ,  
ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଉପମାର ସାହାଯ୍ୟ କତ ମହଜେଇ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହିୟାଛେ—

ଆମି ଶରଂଶେବେର ମେଘେର ମତୋ

ତୋମାର ଗଗନ-କୋଣେ

ମଦାଇ ଫିରି ଅକାରଣେ ।

কাব্যে কোনো বস্তুর ছবছ বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। সেই বস্তুটির সহিত মানবসৃষ্টির সংযোগটিকে প্রকাশ করা অর্থাৎ সেই বস্তুটির ছায়া মাঝের ভাবরাজ্যে কিভাবে পড়ে তাহা প্রকাশ করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। সুতরাং কাব্যে তাহার বর্ণনা করিতে হইলে অর্থাৎ ভাবটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবময় ভাষার প্রয়োজন হয়। ইহা বিজ্ঞানের অর্থপ্রধান আবেগহীন নৈর্যক্তিক ভাষার দ্বারা সম্ভব হয় না। কাব্যে এমন অনেক বস্তু বা জীবের অবতারণা করা হয় যাহা নিছক কাল্পনিক। কাল্পনিক বলিয়া যে এগুলি অর্থহীন তাহা নহে, কারণ বাস্তব জগতের সত্যবর্ণনা করা কাব্যের কার্য নহে, ভাবজগতের প্রকাশই কাব্যের কার্য; এবং ভাবজগতে এইসব কাল্পনিক বস্তু বা জীব সত্য এবং তাহাদের অস্তিত্ব অনুভূতিতে। এইরূপে ক্রপকথার রাজ্য ও তাহার রাজারানী শিল্পরচনায় সত্য ও সজীব। নানা দেবদেবী ও অঙ্গুত জীবসকল—যেমন রাক্ষস ও গন্ধর্ব-কিন্ধুবদল—কাব্যে বাস্তব ও বাস্তব জগতের প্রাণীদের মতোই আদরণীয়। কবি যখন বলেন—

দক্ষিণমুদ্রাপারে,  
তোমার প্রাসাদস্থারে

হে জাগ্রত রানী

তখন সত্যই মনে হয় বহুদূরের সাগর পারাইয়া এমন কোনো অপুরণ প্রাসাদ আছে যেখানে কাব্যরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মী বাস করেন। এই কঠোরা স্বামীনী ক্লান্তি বা বিশ্রাম জানেন না এবং অসময়ে অবসর কবিকে প্রেরণার বার্তা পাঠান।

### ১৬. চিত্রকলা ও তাহার প্রকাশপদ্ধতি

আমাদের শাস্ত্রে বলে, একই বহু হইলেন ও এইরূপে স্ফটি সম্ভব হইল। সেইজন্য প্রথমেই ক্রপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের

চোখে পড়ে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রে বলে ছবির ছয় অঙ্ক, যথা, ক্রপভেদ প্রমাণ ভাব লাবণ্য সান্দেশ এবং বর্ণিকাভঙ্গ।

ভেদ লইয়া ছবি শুরু। এই ভেদ বা বৈচিত্র্য প্রধানত চিত্রের বিষয়বস্তুর মূলভাবটির আশেপাশে আরও কয়েকটি বিভিন্নপ্রকার ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হয়। যেমন অবনীজ্ঞনাথের ‘তাজ-নির্মাণ-স্বপ্ন’ চিত্রে সয়াট শা-জাহানের ধ্যানমগ্ন শাস্ত মুখছবিটিই ঐ চিত্রের মূলভাব; কিন্তু আকাশে ঝান প্রদোষালোকের পাশে একফালি শুভ চন্দ্রকলা ও নীচে ঘমনার নীলজল চুম্বন করিয়া একটি অঞ্চলিক মত মর্মর তাজ— এইসব বিভিন্নভাবগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া ছবিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলোর ‘লা-পিয়েটা’ চিত্রেও এইরূপ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন ভাব সন্নিবেশের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। নাটকে এই বৈচিত্র্য বিচ্ছেদ-দৃশ্যের পটের পর মিলনের দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়া আরও ভালোভাবে বোঝানো যায়। চিত্রে এই ভেদ ছন্দ এবং আলোচায়া বা রেখা-সমাবেশের বৈপরীত্য দিয়াও দেখানো হয়। নানারীতির রেখা আছে, তন্মধ্যে সরল ও বক্র রেখাই প্রধান। বিভিন্ন রীতির রেখায় বিভিন্ন ভাব জাগায়। গাছের কাণ্ডটি সরলরেখায় নির্মিত, কিন্তু উপরের পত্রপুষ্পের মুকুটটি বক্র রেখায় রচিত। এইখানে প্রকৃতির রূপে রেখা-সমাবেশের বৈপরীত্য দেখি। চিত্রে এই রেখা-সমাবেশের রীতি চিত্রকর নিজে উন্নাবন করেন, কারণ রেখা-সমাবেশ চিত্রচনার প্রধান বস্তু। সরলরেখা ও বাঁকারেখার মধ্যে একটা প্রকৃতিগত বিবাদের সম্পর্ক আছে এবং এই বিবাদ-বস্ত অবলম্বন করিয়া একজাতীয় রেখা অঞ্জাতীয় রেখার ‘পোষকতা’ করে, যেমন বাঁকারেখার পাশে সরলরেখা অধিকতর ঝজু মনে হয়। আলংকারিক রীতির নকশাতে বাঁকারেখা একেবারে বাদ দিয়া নিছক সরলরেখার আশ্রয়ে চিত্রচনা করা যায়। চীন ও

জাপানের চিত্রে রেখা-কল্পনার যথাযথতা বিশেষভাবে বিদ্যমান। আলোচায়ার বৈপরীত্যও রেখাকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়। ছবিতে ছন্দলীলার স্থষ্টি ও রেখার কাজ। চিত্রে ছন্দের গতিলীলা প্রত্যক্ষভাবে দেখানো সম্ভব নহে, কারণ চিত্রের বিষয়বস্তু নড়িতে পারে না। চিত্রে গতি বা ছন্দলীলা প্রকাশের একমাত্র উপায় বাঁকারেখা-সমষ্টির আশ্রয় গ্রহণ। পদ্মমূলালের নমনীয় আঁকাবাঁকা রেখায় ছন্দ আছে। বাঁকারেখার প্রত্যেক বাঁকে একটা নির্দিষ্ট সংযত ভঙ্গি থাকে। এই সংযমই ছন্দের প্রাণ। চিত্রে রেখার নানা ভঙ্গির গতি একটা নিয়ম সংযম বা যতির নিগড়ে বাঁধিতে পারিলে ঐসমস্ত রেখার মালা ছন্দে স্ফূর্তি করিয়া ওঠে। রেখার স্থান চিত্রে খুব বড়, কারণ রেখা দ্বারাই চিত্রে বৈচিত্র্য এবং ছন্দলীলার স্থষ্টি হয়। প্রত্যেক রেখার নিজস্ব একটি অর্থ আছে, কারণ রেখা হইতেই অক্ষরের ও ক্রপের স্থষ্টি। বৃত্তরেখায় আমরা পরিপূর্ণতার আভাস পাই, সরলরেখা উন্নতভাবে জাগায়। বাস্তবিক রেখার গঠনরীতির উপর চিত্রের ভাব বহুলাঙ্গশে নির্ভর করে। ‘কিউবিস্ট’ শিল্পীগোষ্ঠী চতুর্কোণ ও ত্রিকোণ খণ্ডের রেখা-সমাবেশে এক অভিনব চিত্ররচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন।

ছবিতে এই ভেদ বা বৈচিত্র্যের সঙ্গেই পরিমাণ (প্রমাণ) বা ভারসাম্য যথক করিয়া রাখিতে হইবে। আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, সুন্দরের জন্যই সীমা— এইখন ছবিতে জানাইতে হইবে। সত্য ও সুন্দরের একই ধর্ম— একদিকে তাহা ক্রপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে প্রথক ও আপনার মধ্যে বিচির, আর-একদিকে তাহা পরিমাণ বা সামঞ্জস্যের স্বীকার্য চারিদিকের সহিত ও আপনার মধ্যে সুন্দর সংগতিতে মিলিত। এই ভারসাম্য দ্বারা চিত্রের বিভিন্ন বিচির ভাব সঙ্গেও মূল একটি ভাবকেই মুখ্য করিয়া তোলা যায়। কোনো ছবিতে রেখা বা বস্তু

-সমাবেশের বাছল্যে চিত্রবস্ত থখন একদিকে ঝুঁকিয়া যায় তখন তাহাকে ওজনে সমান করিবার জন্য অঙ্গদিকে কোনো ন্তৃত বস্তর সমাবেশ করিতে হয়। এই ভারসময় রচনা-রীতির আদল কথা। ইউরোপীয় চিত্রে এই ভারসাম্য কোনো বিপরীত আকর্ষণের সামগ্ৰী চিত্ৰিত কৰিয়া দেখানো হয়, যেমন বটিচেলিৰ ‘ভেনাসের জন্ম’ চিত্রে বিষয়বস্তুৰ ডান দিকেৱ দেবকণ্ঠাটিৰ ছন্দচঞ্চল ভদ্বি আমাদেৱ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিয়া ডানদিকেৱ বস্ত-গুলিকেও ভদ্বিৰ একঘেয়েমি প্ৰকাশ হইতে বাঁচাইতেছে। চীন ও জাপান দেশেৱ চিত্রে এই ভারসাম্য শৃংস্থান রাখিয়াও বা অপৰ কোনো বিপরীত আকৰ্ষণেৱ বস্ত চিত্ৰিত না কৰিয়াও চমৎকাৰ কৌশলে রক্ষা কৰা হয়, যেমন, কোরিনেৱ ‘মাহুষ ও সারস’ চিত্রে পটেৱ চিত্ৰিত অংশেৱ উপৰ প্ৰায় অধৰেক স্থানেৱ শৃংতাকে পাশেৱ দিকে কেবলমাৰ্ত্ৰ একটি সারগাঁথা অক্ষরেৱ লদ্বা মালা দিয়া মাহুষটিৰ প্ৰকাণ্ড মাথা ও অবয়বেৱ ভাৰসাম্যে ও যথাযোগ্য ওজনে টানিয়া রাখা হইয়াছে।

চিত্রে আলো ও ছায়া ঠিক সমান ওজনে ভাগ হয় না, অৰ্থাৎ বদি কোনো বিশেষ মাপেৱ আলোকেৱ পাষাণ ভাঙ্গিতে হয় তাহা হইলে ঐ পরিমাণেৱ অধিক ছায়াৰ সংস্থাপন কৰিলে তবে ভাৰসাম্য বক্ষিত হয়। যেমন, টিশিয়ানেৱ ‘লা-ভিয়ানা’ চিত্রে যতখানি অংশ আলোকে উজ্জল তাহাৰ প্ৰায় তিনগুণ বেশি অংশ ছায়াৰ নিমগ্ন কৰিয়া তবে চিত্ৰকৰ ভাৰসময় রক্ষা কৰিতে বা আলো ও ছায়াৰ পাষাণ ভাঙ্গিতে পাৰিয়াছেন। এই আলোছায়াৰ বৈপৰীত্যকে chiaroscuro বলা হয়।

ছবিৰ মধ্যে ঐক্য আনিতে ভাৰসাম্য ব্যৱীত ভাব ও সামৃদ্ধেৱ সহায়তাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰত্যেক চিত্ৰেই উদ্ব হয় কোনো-একটি ভাব বা অনুভূতি হইতে যাহা শিল্পীৰ মনে প্ৰকাশেৱ তাগিদ লইয়া

আসে ও কৃপস্থষ্টিতে প্রবৃত্ত করে। এই প্রকাশ বা সৌন্দর্যরসের অভূতি না জাগিলে শিল্পস্থষ্টি নির্বর্থক। যে ভাবটিকে চিত্রকর কৃপ দিতে চাহিতেছেন, প্রেরণা গভীর ও উপলক্ষি-শক্তি বলিষ্ঠ হইলে একটি রেখাপাত মাত্রে চিত্রে তাহার অথও ঐক্য ও বিশিষ্টতা ফুটিয়া ওঠে। কবিতায়ও একটি-চূটি ছত্রে ভাবটি কি অপরূপ ভাবেই ফুটিয়া ওঠে; যেমন বৈশাখের বর্ণনায়—

দীপ্তচন্দ্ৰ হে শীর্ণ সন্ধ্যামী

পদ্মাসনে বস আসি রহনেত্র তুলিয়া ললাটে।

চীন-জাপানের চিত্রে স্বল্প রেখাপাতেই ভাব ফুটানোর সুন্দর দৃষ্টান্ত বিশ্বাস। চিত্রের মূল্য তাহার প্রকাশভঙ্গির লাভণ্য ও যথাযোগ্যতার উপর নিরূপিত হয়। চিত্রকরের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গির উপরই নির্ভর করে। ছবি যখন দেখি, আমরা ছবিটির অর্থ বা ভাবটিকেই জানিতে চাই। সেইজন্য ভাবপ্রকাশ সুন্দর ও যথার্থ হইলে ছবি সার্থক হয়।

ছবিতে ঐক্য আনিবার তৃতীয় ও বিশেষ উপায় সাদৃশ্য। সাদৃশ্যের দুই দিক— একটি বাহিরের, একটি ভিতরের। উভয়েরই প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় শিল্পীর তাঁহাদের রচনায় বাস্তববাদিতার চূড়ান্ত সাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্রে ভারসমতা, কাঠামো-বীতি, আপেক্ষিক পরিমাণ, ঘনত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত— সবই প্রকৃতির অঙ্ককরণের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই সাদৃশ্য আনয়ন বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফল, এবং ভারতীয় শিল্পেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায় না তাহা নহে; যেমন, কমল-নয়ন, সিংহকটি, গোমুখ সদৃশ পৃষ্ঠদেশ, বাঙ্গুলী-ওষ্ঠ ইত্যাদি আমাদের দেশের শিল্পে মানবদেহের আদর্শ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া ধরা হইয়াছে। তবে এগুলিকে ঠিক বাস্তবাঞ্চ-

সরণ বলা যাব না, বরং এই উপমাগুলি দ্বারাই পূর্বদেশীয় শিল্পস্থিতিতে অপরূপ কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই যাহা না থাকিলে শিল্পীর কৃপস্থিতি ব্যর্থ। পূর্বে বলিয়াছি সাদৃশ্য দ্রুই রূপ—এক বাহিরের, অগ্নিটি ভিতরের; একটি রূপের সহিত রূপের সাদৃশ্য, অগ্নিটি ভাবের সহিত রূপের সাদৃশ্য। বিচার করিলে দেখা যায়, এই সাদৃশ্য বস্ত্রবেংশ ও প্রকৃতির নিছক প্রতিলিপি হইলে শেষপর্যন্ত আমাদের মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না; কারণ শিল্পীর মনের ছবিটি প্রধানত বেখার ছবি নহে, তাহা রসের ছবি; তাহার মধ্যে এমন-একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা সংসারের বস্তুতাত্ত্বিক প্রত্যহের চোখ দিয়া আমরা প্রকৃতিতে সব সময় দেখি না। ছবি দেখিবার সময় কিন্তু অনুভূতির মনটি লইয়াই আসি এবং শিল্পীর অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে তাহার রচনায় প্রধানত দৃশ্যমান দেখিলে তবেই তৃপ্তি হই। এই তৃপ্তি রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য দেখিয়া— যাহা অন্তরের সহিত বাহিরকে মিলিত করে, যাহা অন্তরে দৃশ্যে প্রতিফলিত করে এবং এই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্যই শিল্পীর স্থিতিকে সার্থক সুন্দর ও প্রাণবান করে।

এক সময় ইউরোপীয় শিল্পীরা প্রকৃতির হৃষে অহুকরণের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। সেই ঝোঁকের প্রতিক্রিয়া এখন বাস্তবকে অঙ্গীকার করিতে চাহিতেছে। ইহা ঠিক নহে, কারণ দ্রুইয়েরই আবশ্যক আছে। সমস্ত বাস্তব অরুণস্তুতি বাদ দিলে মাঝের ইলিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, তখন মনও স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। তবে শিল্পী কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিবাদী হইতে পারেন না, কারণ মনের স্পর্শ দ্বারা কৃপাস্তরিত প্রকৃতির রূপকেই মাঝে প্রকাশ করিতে ও দেখিতে চায়। শিল্পী নিখিল-মানব-হৃদয়ের গোপন ভাবটিকে কোনো-এক মুহূর্তের প্রেরণায় তাহার সাধনার ফল স্বরূপ প্রকৃতির রূপে উপলব্ধি

করেন। এই উপলক্ষিকেই শিল্পী রূপ দেন এবং সাদৃশ্য এখানেই সার্থক হইয়া শিল্পরচনাকেই মাঝ্যের মনে নিত্য-আসন দেয়।

এইবাবে বর্ণিকাতঙ্গ। সংগীতে যেমন সাতটি সুর ও বহু শ্রুতি আছে সেইরূপ চিত্রশিল্পের ভাষাতেও সাতটি ঋবের অনুক্লপ সাতটি মূল বর্ণ আছে, যথা— বেণুনি, তুঁতে, নীল, সবুজ, হরিৎ, কমলা ও লাল। এই সাতরঙ্গের ধে-কোনো ছাঁটি রঙের মধ্যে আরও বিভিন্ন ওজনের রঙের রেশ বা বর্ণাভাস আছে। এইগুলির সাহায্যে শিল্পী তাঁহার বক্তব্য ছবিতে বলেন। ঐ সাতটি রঙকে চিত্রভাষার স্বরবর্ণ বলা যায়। প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে রঙের। বিভিন্ন রঙ বিভিন্ন বস্তুর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং রঙগুলির ভাবপ্রকাশ ব্যতীত আরও গভীর অর্থ আছে যাহা দ্বারা আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর রূপে বর্ণিতে কল্পনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণ নীলবর্ণ, কারণ তাঁহাকে অথিল-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত অনাদি অনন্ত পরমপুরূষ বলিয়া জানি। জ্ঞান ছী ও ধীর অর্ধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে শুভ কমলাসনে শুভনিরঞ্জন-মূর্তিতে কল্পনা করি। আমাদের জাতীয়পতাকার তিনটি বর্ণই বিশেষ বিশেষ ভাব বা আদর্শের প্রতীক। রঙের একটি প্রভাবশক্তি আছে, যেমন, লাল রঙ উত্তেজক, ইহা শক্তি মৌভাগ্য ও অস্ত্রবাগের চিহ্ন; হরিৎ আনন্দের; এবং সবুজ নবীনতাপ্রকাশক ইত্যাদি। বিজ্ঞান বর্ণ সমষ্টে নানা তত্ত্ব আবিকার করিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি এই যে, মাঝ্য বস্তুর রূপ বৃঞ্জিবাবুর বহু আগে বর্ণের শক্তি অনুভব করে। কবিতায় যেমন সুর, ছবিতে তেমনি রঙ আমাদের নৃতন ভাবে ও রসে প্রাপ্তি করে। রেখাচিত্রে আমাদের বুদ্ধি আনন্দ পায়, রঙ কিন্তু আমাদের ভাববাজ্যে গিয়া করাযাত করে। সাতটি বর্ণের মধ্যে লাল হরিৎ ও নীল— এই তিনটিকে মূল বা শুল্ক বর্ণ বলে। বর্ণের সমাবোহ শিল্পীর রেখাচিত্রের

সর্বান্দ ঐশ্বর্যভূষিত করে। চিত্র তখন এক নৃতন ভাবেতে উজ্জীবিত হয়। সংগীতশাস্ত্রের বাদী-বিবাদীর শুরের মত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যেও বাদী-বিবাদীর সম্পর্ক আছে; এই বৈপরীত্যের যথোপযুক্ত ব্যবহারে চিত্রকর অভিনব ভাবের স্ফটি করেন। ইউরোপীয় শিল্পীরা বর্ণসংযোজনায় অঙ্গুত ইন্দ্রজালের স্ফটি করিয়াছেন। বর্ণের এই ঐকতান-রচনা করা চিত্রশিল্পের একটি দুর্লভ কৌশল। রেখা জিনিসটি স্থানিদিষ্ট এবং বর্ণ নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের মেতু।

উপসংহারে এই কথাই বলা যায় যে, সকল প্রকৃত আটেই একটি বাহিরের ও একটি চিত্রের উপকরণ থাকা চাই— অর্থাৎ একটি রূপ, অপরটি ভাব। এই উপকরণকে সংযম দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়, বাহিরের বাঁধন পরিমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পর এই ভিতর ও বাহিরকে মিলাইতে হইবে সাদৃশ্যের জন্য। কিমের সঙ্গে সাদৃশ্য? বৰীজ্ঞনাথ বলিয়াছেন, ‘এই সাদৃশ্য হইবে ধ্যানরূপের সহিত কল্পরূপের।’ তার পর এই সাদৃশ্যকে ব্যঙ্গনার রঙে বাঙাইতে পারিলে তবেই ষথার্থ আনন্দরূপের প্রকাশ হইয়া শিল্পের দৌন্দর্ঘষ্টি সার্থক হইবে।

### ১৭. ভাস্কর্য ও সংগীত

চিত্র-আলোচনার পর এইবার ভাস্কর্য ও সংগীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। ভাস্কর্য তিন মানের শিল্প— রেখা, নানা পরিসরের মুখ বা ক্ষেত্র, এবং আলো ও ছায়ার অবকাশ। সম্ভল ক্ষেত্রের বুকে নানা আকৃতির গহ্বর কাটিয়া নানা পরিসরের আলোকপাত করিয়া ভাস্কর তাঁহার কল্পিত মূর্তিকে ফুটাইয়া তুলেন। রেখা দ্বারা ভাস্কর তাঁহার কল্পিত রূপের সীমা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা নির্ধারণ করেন। কাঠ বা পাথরের খণ্ড হইতে এইরূপে খোদাই করিয়া মূর্তির আদল বাহির করিতে

শিল্পীর বহুদিন লাগে ; ততদিন তাহার মানস-প্রতিমাকে শিল্পী মনের  
মধ্যে জাগ্রত রাখেন— বেন বাহিরের অনাবশ্যক অংশ দ্বারা লুক্ষণ্যিত  
প্রতিমাটির আবরণ শিল্পী ধীরেধীরে মোচন করিতেছেন।

রেখাবর্ণের চিত্র অপেক্ষা ভাস্করের গঠিত মূর্তির মাঝা অধিকতর  
বাস্তব, কারণ ইহাতে আমরা সত্যবস্তুর অনুকূল অনুভূতি লাভ করি।  
ভাস্করের রূপ-কল্পনার বিচার তাহার রেখাসমষ্টির ঐকতানের উপর এবং  
তাহার নানা পরিসরের ভারসংগতির উপর নির্ভর করে। চিত্র অপেক্ষা  
ভাস্কর্যে রেখার মূল্য আরও বেশি, কারণ বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছন্দের  
আলোকপাতে মূর্তির উপর রেখার তারতম্য ঘটে। প্রাচীনকালে গ্রীসে  
ও রোমে মূর্তিতে বর্ণ যোজনার বীতি ছিল। ভারতে মাটির দেবদেবীর  
প্রতিমায় এখনও বর্ণ সংযুক্ত হয়। বর্ণযোজনার প্রথা ব্রহ্মিত হইয়া  
মূর্তিশিল্প রেখা ও আলোক-পাতের দুইটি মাত্র সাধনে সৌমবন্ধ হইয়াছে।  
পাথরের উপর পক্ষব ও মশুণ ভাব ফুটাইয়া ভাস্কর মূর্তিশিল্পে বিপরীত  
ও বিবাদী রসের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিনব ভাব ফুটাইয়াছেন। ভারতে  
পহলবয়সের কয়েকটি খোদিত প্রস্তরফলকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে।  
ভাস্কর্যেও ছন্দরচনা একটি অপরিহার্য উপাদান ও সাধন। রেখা রচনা  
ও সংস্থানের মধ্যে তাহার প্রকাশ। সঁচৌক্ষণ্যে এই ছন্দলীলার নিপুণ  
উদাহরণ দেখা যায়।

ভাস্কর্যশিল্পে আর-একটি বিশিষ্ট বস্তুপ্রকাশের স্বরূপ আছে— ইহা  
স্থির রস বা শাস্ত রস ; ইহার স্থূলর দৃষ্টান্ত ভারতের ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’।  
নিশ্চল পাবাণে গতির চক্রলতা ফুটানো স্থির রস ফুটানো অপেক্ষা  
কঠিন। ইহার স্থূলর নির্দর্শন মাইরনের ‘চক্র-নিষ্কেপকারী’ মূর্তিতে।  
এই গতিশীল মূর্তির বেগ-ধারণের সার্থক মুহূর্তটি নিপুণ কৌশলে  
ধৰা হইয়াছে। গতি ও স্থিতি দুটি আপেক্ষিক বস্তু। গতির তুঙ্গ

অবস্থায় ক্ষণিকের স্থিতি দেখা যায়, যেমন, সমুদ্রের টেটুটি ভাঙ্গিয়া গড়িবার পূর্বমুহূর্তে ক্ষণেক স্থির হইয়া দাঢ়ায়। ইহা নিশ্চলতা নহে, হইটি শক্তির বিরোধের মধ্যে সাময়িক গতিহীনতা। এই গতির মধ্যে স্থিতির অতি স্থন্দৰ দৃষ্টান্ত ভাস্করের অপূর্ব কল্পনা ‘নটরাজ’-মূর্তি।

পশ্চিমদেশে ভাস্কর্যের ধারণা আদর্শ মানবদেহ আঞ্চল করিয়া অত্যন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সকল শিল্পস্থির উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাস্কর্যেও স্বাধীন কল্পনার অবকাশ আবশ্যক। এই অবাধ অপরপ কল্পনা ভাস্কর্যে ‘নরসিংহ’ ‘মেকমেটের’ ‘ঘালী’ প্রভৃতি মূর্তিতে সৌন্দর্যের অভিনব ভাব প্রকাশ করিতেছে।

কানে শোনার পথে শব্দ ও স্বরের ভাষায় পার্থক্য আছে। কথা বৃক্ষিগম্য সকল ভাবকে প্রকাশ করে, কিন্তু স্বর অনিবচনীয়ের সংবাদ আনিয়া অনুভূতির তন্ত্রীকে আকুল করে। সৌন্দর্যের সাধনায় বা ভাব-প্রকাশের সার্থকতায় সংগীতের স্থানই প্রধান, কারণ বাণীর সহিত স্বর সংযুক্ত হইয়া গান অপূর্ব প্রাণেশ্বর্যে মণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ‘চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে।’ অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা ষৎসামান্য, সংগীতের দ্বারা তাহা অসামান্য হইয়া ওঠে, কারণ কথার মধ্যে বেদনা সংগীতই সংক্ষার করিয়া দেয়। স্বরের ও কথার ভিত্তিগত প্রভেদ এই যে, কথার বিশেষ প্রকাশ ভাবে। প্রতিভাশালী কবি কবিতার ছন্দে এবং রসাত্মক ভাবঘন শব্দের জাল পাতিয়া মানবহন্দয়ের অনেক সূক্ষ্ম ভাবারূভূতিকেই বন্দী করিতে পারেন, কিন্তু মাঝের অন্তরলোকের অনিবচনীয়কে প্রকাশ করিতে সক্ষম একমাত্র স্বর। প্রচণ্ড শারীরিক ক্লেশের বেদনা-বোধেও আমরা যে আর্তনাদ করি তাহা ও শব্দের সহিত স্বর সংযুক্ত

କରିଯା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ । କଥାର ଆବେଦନ ଓ ସୁରେର ନିବେଦନେର ମଧ୍ୟ ଏକଟା ଦୋଟାନାର ଭାବ ଥାକିଯା ଯାଏ । ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲାନ୍‌ମିଳାଲ ଗାନେ ସେଥାନେ କଥାବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ, ସୁର ଦେଖାନେ ଆପନାକେ କତକଟା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାର କରେ ।

ନକଳ ପ୍ରକୃତ ଆଟେ ମୌନ୍ଦର୍ସଟିର ଯେ ରୀତି, ତାହାଇ ସଂଗୀତ-ଶିଳ୍ପ ମୟକେଓ ଥାଏ । ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେର ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ତ୍ୟାଗ ସଂଗୀତେର ସାତଟି ସୁର ଓ ଏକ ଶୋ ଆର୍ଟାଶ୍ଟଟି ଶ୍ରାତି ବା ସୁରାଭାସ ଏକଟି ବିଶେଷ ନିୟମ ବା ମଂସମେ ବୀଧା ପଡ଼ିଯା ଭାବ ସ୍ଥଟି କରେ । ତିନଟି ଗ୍ରାମେ ଉଦ୍ଦାରା ମୁଦ୍ଦାରା ଓ ତାରାଯ ସୁରଙ୍ଗତିର ଆଧାତ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଲୋକେବ ହୁଏର ଖୁଲିଯା ଦେଇ । କାବ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରେର ମତ ସୁରେର ବ୍ୟାଙ୍ଗନା ଓ ଅଳଂକାର ପ୍ରଭୃତି ଆଛେ । ନାନା ବିଚିତ୍ର ପର୍ଦାର ପଥେ ଘୁରିତେ ଘୁରିତେ ସକଳ ସୁର ଏକଟି ମଂଗତିତେ ଲାଗେ ପାଇ । ନାନା ସୁର ନାନା ଭାବ-ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୟେ ବିଭିନ୍ନ ସୁରେର ସାଧନାର ରୀତି ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରେ ଦେଖା ଯାଏ ।

ମୋଟାମୁଟିଭାବେ ସଂଗୀତେର ବିଚାର କରିଲେ ଦେଖା ଯାଏ, ଇହାର ଉପକରଣ ଅଧିନତ ଧରନି ମାତ୍ର, ସାହା ଅତି ଲୟ ଏବଂ ମରାସରି ବା ଅପରୋକ୍ଷ-ଭାବେ ଭାବପ୍ରକାଶ କରେ । କାବ୍ୟେ କଥାର ଧରନିଗୁଲି କାଜେ ଲାଗେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥେର ମଧ୍ୟ ଦିଯାଓ ଭାବେର ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ଵତରାଂ ମେଥାନେ ଭାବପ୍ରକାଶଇ ପରୋକ୍ଷଭାବେ ହୁଏ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମଂଗିତେ ଇହା ଅପରୋକ୍ଷଭାବେ ହୁଏ । ଦାର୍ଶନିକ ଶୋପେନହାୟାର ବଲେନ, ଶିଳ୍ପେର ମଧ୍ୟ ମଂଗିତେ ସଂଗୀତେର ସ୍ଥାନ ମରୋଚ ।

### ୧୮. ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ସୌନ୍ଦର୍ୟ-ଦର୍ଶନ

ଆମରା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ୟ-ଦର୍ଶନ ଆଲୋଚନା କରିତେଛି ଇହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟେର ସୌନ୍ଦର୍ୟବିଦ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥର ଅଭିମତେର ମୟସ୍ତ ମାତ୍ର । ଏଇ ଦାର୍ଶନିକଗଣେର

ଅଧିକାଂଶଇ ଇଉରୋପୀୟ । ତାହାରା ବଲେନ, ପ୍ରକାଶଇ ମୌନର୍ଥହଷ୍ଟିର ମୂଳେ । ଇଟାଲୀୟ ଦ୍ୱାରା ନାର୍ଥନିକ କ୍ରୋଚେ ଏହି କଥା ପ୍ରଥମ ଜୋର ଦିଯା ବଲେନ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରକାଶକେ ଶିଳ୍ପହଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ମତ୍ୟ ବଲିଯା ମାନିଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ଉହାକେଇ ଶେଷ ବା ଏକମାତ୍ର ମତ୍ୟ ବଲିଯା ମାନିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହନ ନାହିଁ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଲେନ, ଶ୍ରୁତ ପ୍ରକାଶ ହଇଲେଇ ଚଲିବେ ନା, କି ଏବଂ କତଖାନି ପ୍ରକାଶ ହଇଲ ତାହାଓ ବିଶେଷ ବିବେଚ୍ୟ । ତାହାର ମତେ ସାହିତ୍ୟ-କୋନୋ ଭାବକେ ଫୁଟାଇଯା ତୁଳିଲେଇ ବଚନାର ସାର୍ଥକତା ହୁଯ ନା, ବଚନାର ବିଷୟ ବା ଭାବଟିକେ ଓ ସୁନିର୍ବାଚିତ ହଇତେ ହଇବେ— ଯାହା ମାନୁଷେର ସଥ୍ୟପଥ ପରିଚୟ ଦେଖାଇତେ ପାରିବେ । ପେଟୁକତା ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଦେଖା ଯାଏ, ତାହିଁ ବଲିଯା କି ଇହାକେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମଭକ୍ତି, ମ୍ରେହଦୟାର ପଂକ୍ତିତେ ବସାନୋ ଯାଏ ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବଲେନ, ସାହିତ୍ୟ ମୂନର କରିତେ ହଇଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯେର ହୈନତର ବୃତ୍ତି-ପ୍ରବୃତ୍ତିକେ ବର୍ଜନ କରିଯା ମାନବ-ସ୍ଵଭାବେର ଉଚ୍ଚତର ଧର୍ମ ଓ ହନ୍ୟବୃତ୍ତିଗୁଲିକେଇ ମୌନର୍ଥହଷ୍ଟିର ସାମଗ୍ରୀ କରିତେ ହଇବେ । ମାନୁଷେର ପେଟୁକତା ଏକଟି ଅତି ବାସ୍ତବ ମତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମରା ମତ୍ୟକେ ଚାହିତେଛି ନା, ମାନୁଷକେ ଚାହିତେଛି । ନୀଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟ-ବୃତ୍ତିଗୁଲି ମାନବଧର୍ମେ ବା ମାନବେତିହାସେ ଥାଇଁ କୋନୋ ଆସନ ପାଇ ନାହିଁ— ସୁତରାଂ ସାହିତ୍ୟ-ଦେହେ ତାହାଦେର ସ୍ଥାନ ଦେଓରା ମାନେ ମାନୁଷେର ମିଥ୍ୟ ବର୍ଣନା ଦେଓରା ।

ସୁତରାଂ ଦେଖିତେଛି, ପ୍ରକାଶମାତ୍ରକେଇ ମୌନର୍ଥର ହଷ୍ଟ ବଲିଯା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମନେ କରେନ ନାହିଁ । ତାହାର ମତେ ସଥ୍ୟର୍ଥ ମୌନର୍ଥ ତାହାଇ ଯାହାତେ ବିଶ୍ଵକ ଆନନ୍ଦ ପାଓଯା ଦୟ, ଏବଂ ସାର୍ଥକ ସାହିତ୍ୟ ଆମରା ଏହି ଆନନ୍ଦରୂପ ଲାଭ କରି । ସେ-କୋନୋ ଭାବ ପ୍ରକାଶେଇ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଆନନ୍ଦରୂପ ଆସେ ନା, ସୁତରାଂ ମୌନର୍ଥହଷ୍ଟିତେ ମହି ଆନନ୍ଦ ଫୁଟାଇତେ ହଇଲେ ଭାବନିର୍ବାଚନେ ଓ ସଂସମ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆରା ବଲେନ ସେ, ମୌନଦ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ନହେ । ମାଉସେର ସହିତ ବହିଃପ୍ରକ୍ରତିର ସେ-ଈକ୍ଯ ତାହାକେ ପ୍ରକାଶ କରିଯା ମାନ୍ୟ-ଅନ୍ତରେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଚେ ତାହାର ମନ୍ଦାନ ଓ ଶିଳ୍ପଶିଥିତେ ମିଳାଇତେ ହିବେ । ପ୍ରକ୍ରତିର ବଜ ଖଣ୍ଡଗୁ ରୂପ ଆଚେ, ତାହାର ସ୍ଵୟମା ଆମାଦେର ସ୍ଵତ୍ଥ ଦେଇ; କିନ୍ତୁ ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁ ସ୍ଵୟମାଯ ଖଣ୍ଡ ମତ୍ୟାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇ— ସମ୍ପଦ ମତ୍ୟ ପାଇ ନା । ଏହିବ ଖଣ୍ଡବିଭାଗ ସଥନ ଏକ ହଇଯା ସମ୍ପଦ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ୟର ଆଭାସ ଆନିଯା ଦେଇ ତଥନ ଆମରା ଖଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗେର ସ୍ଵତ୍ଥ ତୁଳିଯା ଯାଇ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଆନନ୍ଦରୂପକେ ଉପଲବ୍ଧି କରି । ଇହାର ଜନ୍ମ ସାଧନା ପ୍ରୋଜନ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ମନ ଓ ପରେ ଏକେ ଏକେ ବୁଦ୍ଧି ହନ୍ଦୟ ଧର୍ମଚେତନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଆବରଣ ମୋଚନ କରିଯା ଆନନ୍ଦଲୋକେର ଦୟାର ଖୁଲିଯା ଦିବେ । ଶ୍ଵତ୍ରାଂ ମୌନଦ୍ୟକେ ମହି ଏବଂ ସଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିତେ ହିଲେ ମାଉସକେ ତାହାର ଉନ୍ନତ ମାନସିକ ବୃତ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସହାୟତା ଲାଇତେ ହିବେ ।

ଏହିଭାବେ ଦେଖା ଯାଇତେଛେ, ବୈଜ୍ଞାନାଥେର ମତେ ମୌନଦ୍ୟର ଉପଭୋଗ ଅତ୍ୟକ୍ରମିତ ଜନ୍ମ ହନ୍ଦ୍ୟାବେଗ ଅପେକ୍ଷା ସମାହିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜାଗତ ଚେତନାର ପ୍ରୋଜନ ଅଧିକ । ବୈଜ୍ଞାନାଥ “ସାହିତ୍ୟ” ଗ୍ରହେର ‘ମୌନଦ୍ୟବୋଧ’ ପ୍ରବକ୍ଷେ ବଲିଯାଛେ, ‘ସଥାର୍ଥ ମୌନଦ୍ୟ ସମାହିତ ସାଧକେର କାହେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଲୋଲୁପ ଭୋଗୀର କାହେ ନହେ ।’ ବୈଜ୍ଞାନାଥ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟେ ମଙ୍ଗଲକେ ଦେଖିତେ ଚାନ । ତିନି ବିଶ୍ଵକ ମୌନଦ୍ୟ-ମୂଳିକଦେର ମତ ମୌନଦ୍ୟରୋପଲବ୍ଧିକେ ଏକଟି ସ୍ଵତତ୍ତ୍ଵ କିମ୍ବା ମନେ କରେନ ନାହିଁ । ମୌନଦ୍ୟଚର୍ଚା ବଲିଯା ଇଉରୋପେ ସେ ଏକଟି ସାମ୍ପଦାଯିକ ଧୂର୍ବା ଆଚେ, ବୈଜ୍ଞାନାଥ ତାହାର ବିରୋଧୀ ଛିଲେନ । ମତ ସ୍ଵନ୍ଦର ଓ ଶିବକେ ତିନି ଏକ କରିଯା ଦେଖିଯାଛେ ଏବଂ ବଲିଯାଛେ, ‘ମୌନଦ୍ୟମୂଳିତିଇ ମଙ୍ଗଲେର ପୂର୍ଣ୍ଣମୂଳିତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଲମୂଳିତି ମୌନଦ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପ ।’

ବୈଜ୍ଞନାଥ ଆରା ବଲିଯାଛେ ‘ମତ୍ୟେର ସଥାର୍ଥ ଉପଲକ୍ଷିମାତ୍ରାଇ ଆନନ୍ଦ, ତାହାଇ ଚରମ ମୌନଦୟ ।’ ଆମରା ଦେଖିଯାଇଛି, ମତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନ୍ଦଲକେ ପରମାର୍ଥେରି ତିନଟି ରୂପ ବଲିଯା ଧରା ହୁଏ । ବୈଜ୍ଞନାଥ ମେହି ପରମାର୍ଥକେଇ ଉପଲକ୍ଷି କରିଯା, ମତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନ୍ଦଲେର ‘ନଂଜାଗୁଲିର ମଧ୍ୟେ ବିଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଗକେଇ ଅଧିକତର ପ୍ରକାଶ ହିତେ ଦେଖିଯାଛେ । ଏହି ମତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତଥ୍ୟେର ଖଣ୍ଡ ମତ୍ୟ ନାହେ, ଇହା ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ମତ୍ୟ, ଯାହା ଅନ୍ତରୀଆମକେ ମମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଷ୍ଟିର ମହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଲେ ଉପଲକ୍ଷି କରା ଯାଏ । ମନ୍ଦଲକେଓ ତିନି କେବଳମାତ୍ର ନମାଜସ୍ଵାର୍ଥ ବା ସ୍ୱଭାବିତ୍ସାର୍ଥେର ହିତ-ସାଧନ-ମାତ୍ର କରିଯା ଦେଖେନ ନାହିଁ । ମନ୍ଦଲ ଇହା ଅପେକ୍ଷାଓ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ । ସୁନ୍ଦରକେ ମନ୍ଦଲମୟ ଦେଖିଯାଛେନ ବଲିଯା ବୈଜ୍ଞନାଥ ସେ ମାହିତ୍ୟକେ ଶିଙ୍କାମୂଳକ କରିଯା ତୁଲିତେ ଚାହିଯାଛେନ, ଏକପେ ମନେ କରା ଭୁଲ । ମୌନଦୟକେ ତିନି ପ୍ରୋଜନେର ଗଣ୍ଡିର ଉତ୍ତରେ ତୁଲିଯା ଦେଖିଯାଛେନ ଏବଂ ମନ୍ଦଲକେ ତାହାର ଉତ୍ତରେ ଆରା ବୃଦ୍ଧ ରୂପେ ଉପଲକ୍ଷି କରିଯାଛେ । ମମନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦଲେର ମଧ୍ୟକାର ଗଭୀରତମ ଐକ୍ୟର ମହିତ ବୈଜ୍ଞନାଥ ମାନବାଆର ନିଗୃତ ଯୋଗ ଦେଖିଯାଛେନ ଏବଂ ମନ୍ଦଲ ଓ ସୁନ୍ଦରେର ବିଭେଦ ଦେଖେନ ନାହିଁ । ମତ୍ୟେର ମଧ୍ୟକେଓ ତିନି ଐକ୍ୟ ଦେଖିଯାଛେନ ଓ ମତ୍ୟକେଓ ସୁନ୍ଦର ହିତେ ଭିନ୍ନ ମନେ କରେନ ନାହିଁ ।

ବୈଜ୍ଞନାଥ ଏକଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିଶିଖର ହିତେ ମାନବ-ସାଧନାର ଏହି ତିନଟି କ୍ଷେତ୍ରେର ବିଚାର କରିଯାଛେ; କାରଣ ତାହାର ସାଧନା ଓ ଜ୍ଞାନେର କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଗଭୀର ଏବଂ ସାଧାରଣେ ନିକଟେ ଉହା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୂରବିଗମ୍ୟ । ବୈଜ୍ଞନାଥେର ବିଚାରଫଳଗୁଲିର ଗଭୀରତା ସତଃପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ଉହା ଆମାଦେର ବୁଦ୍ଧିବିଚାରେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତେ ନା ଆମିଲେଓ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେର ସ୍ଵୀକୃତି ସହଜେଇ ପାଇ । ଦର୍ଶନେର ମତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ସଦି ତାହାକେଇ ବୁଝାଯାଇ, ଯାହା ଅତ୍ୟକ୍ରାନ୍ତିର ଫଳ— ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିବିଚାରଦାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ

নহে, তাহা হইলে বৰীজ্জ-সৌন্দর্য-দর্শনকেই সর্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। যে উপলক্ষি দিয়া বৰীজ্জনাথ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের ভেদ সম্বৰ্ধে সুমস্তার সমাধান কৱিয়াছেন তাহার দ্বারাই আৱাও একটি বিশেষ প্ৰশ্নের উত্তৰও দিয়াছেন। রচনায় কবিৰ ব্যক্তিদেৱ প্ৰভাৱ আছে কি নাই?—এই প্ৰশ্নের উত্তৰে কবি কৌট্টি এবং আধুনিক কালে টি. এস. এলিয়ট বাহাৰেন তাহাই আমৱা সাধাৱণ মত হিসাবে মানিয়া লইয়াছি। ঐ প্ৰশ্নের মীমাংসা তাহারা এইভাবে কৱিয়াছেন যে, কবিৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রচনায় থাকে না। মাঝৰ হিসাবে কবিৰ স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে; কিন্তু কবি হিসাবে তাহার এই স্বাতন্ত্ৰ্য থাকে না। কবি রচনা কৱিবাৰ সময়ে অবাধ কল্পনাশক্তি এবং গভীৰ সহানুভূতি দ্বাৰা বিশ্বজনীন ভাবগুলিৰ সহিত এক হইয়া গিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলেন। রচনা-ক্ষেত্ৰে রচয়িতাৰ ব্যক্তিগত আন্তৰিক অনুভূতি নাই, এবং তাহা থাকিবাৰ প্ৰয়োজন নাই। রচয়িতা এখানে বহুৱৃণ্ণি। উৎকৃষ্ট রচনায় তাই ব্যক্তিবিশেষের সুসংগত মতামত বা ক্ৰমবাহী ভাবধাৰা প্ৰকাশ পায় না, যেমন শেক্সপীয়েৰেৰ রচনায় দেখি।

কিন্তু বৰীজ্জনাথ এই অভিমতেৰ বিৰোধী। তিনি বলেন, রচয়িতা তাহার রচনার মধ্যেই আছেন। ব্যক্তি সাহিত্যেৰ মধ্যে প্ৰকাশ হন—কিন্তু সেই ব্যক্তিত এত ব্যাপকভাৱে থাকে যে তাহাকে আমাদেৱ যুক্তিৰ সংকীৰ্ণ ধাৰা দিয়া ধৰিতে পাৰি না। কবি আপনাৰ অন্তৰকেই প্ৰসাৰিত কৱিয়া সকল ভাবনাকে অন্তৰ্মাণ কৱিয়া একটি বৃহৎ ব্যক্তিদেৱ অধিকাৰী হন। স্বতন্ত্ৰ তাহার বিশেষত্ব অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। স্বতন্ত্ৰ কবিৰ রচনা তাহার নিজস্ব অনুভূতিৰ বাহিৱে নহে; কাৰণ তিনি অন্তৰকেই বিস্তৃত কৱিয়া অনুভূতিকে বৃহৎভাৱে উপলক্ষি কৱেন।

এই ব্যক্তিত্ব যত ব্যাপক হইবে সাহিত্যে তাহার প্ৰকাশ হইলে

সেই রচনাও তত বড় হইবে। বৃহৎ সাহিত্যে বৃহৎ ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের শেষোক্ত মতটি আমাদের বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা লইয়া যে ছন্দ চলিয়া আসিতেছে তাহার মীমাংসা হইবার সন্তান আছে।

### ১৯. অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের “বাগেখরী-প্রবন্ধাবলী”তেও শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁহার মতামত অতি সরল ও মনোরম ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি দর্শনকে দর্শনই রাখিয়াছেন— কেবল যুক্তিত্বক দিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। স্বতরাং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনা ভাবগান্ডীর্ঘে এবং সত্যনিরূপণে দর্শন-শাস্ত্রের পংক্তিতে পড়িলেও রচনা-ভঙ্গি এবং প্রকাশগুণে উহা রস-সাহিত্যের উজ্জ্বল মণি। যাহারা সৌন্দর্য-দর্শনের খাসমহলে প্রবেশ করিতে চান তাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ সদর-দরজার মত। জ্ঞানের সহিত সাহিত্যরসের এমন উদার পরিবেশন বাল্মী সাহিত্যের ভাঙারে অল্পই দেখা যায়, এবং ইংরেজি সাহিত্যেও প্রায় বিরল। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এই গ্রন্থের দৃষ্টি-একটি কথা আলোচনা করিবার আছে।

প্রথমত দেখিতে পাই, অবনীন্দ্রনাথ<sup>১</sup> প্রকাশেই সৌন্দর্যের রহস্য দেখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ‘ভাষার তপস্থায় বলীয়ান্ মাছুষ পাথরের কারাগার থেকে বার ক’রে নিয়ে এল ষে-ভাষাকে, চিরস্মধাময়ী রসের নির্বারণী তারই চতুরষ্টি ধারা হল— কথা ছবি মৃতি নাটক গান বৃত্য

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪১

ইত্যাদি কলাবিষ্টা' (পৃ ৮১)। ভাবপ্রকাশেই রসের স্থষ্টি ও রূপের অরুভূতি জাগে এবং সেই ভাবই নানা ভঙ্গিতে ধরা পড়ে—‘রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে স্তুরের ভঙ্গিতে ওঠা-বসা চলা-ফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়ল ভাব, তবেই তো পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আনন্দ রসটা।’ (পৃ ৩৬৩)। বস্তু যে ভাবটিকে জাগায় তাহাকেই গ্রহণ করিয়া শিল্পীকে অপরের কাছে ধরিয়া দিতে হয়—‘প্রথম আপন ক’রে নেওয়া ভাব ক’রে, তারপর সেটিকে সকলের আপন ক’রে দেওয়া ভাবযুক্ত ক’রে—এই হল কৌশল আর্টিষ্টের’ (পৃ ৩৭০)।

ত্রিতীয়ত দেখা যাই, ভাব-বিনিয়মের সমস্তাটির অবনীন্দ্রনাথ অতি সহজে সমাধান করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে, বস্তুর মধ্যে যে ভাব নিহিত আছে তাহা শিল্পী তাহার শিল্পদৃষ্টি দিয়া ধরিতে পারেন এবং সেই ভাবগুলিকে আপনার ভাবে মিলাইয়া আন্তরিক অরুভূতি দিয়াই প্রকাশ করেন। যেহেতু সে ভাবগুলি শিল্পীর নিজস্ব কোনো জৰুরতা বা মায়ার দ্বারা স্থষ্টি নহে তাহার সর্বজনীন, সেইজন্য সবার কাছেই তাহাদের আবেদন আছে, ‘ভাবের জিনিস সে মায়ার অতীত জিনিস, কেননা সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমরা। এবং সেই কারণেই সত্য হয়ে ওঠে সে অন্যের কাছেও’ (পৃ ৩৭১)।

তৃতীয়ত, কোনো বস্তুর যথার্থ সৌন্দর্যের রূপটি দেখা বা বস্তুটিকে শিল্পদৃষ্টিতে দেখা চোখের মায়া নহে বরং উহাই বস্তুটির বৃহত্তর সত্য জানিবার উপায়। সত্য ও সুন্দরে মূলগত কোনো ভেদ নাই। সাধারণ দৃষ্টি দিয়া যা দেখি তাহা দ্রষ্টব্য বস্তুর সবটুকু সত্য দেখায় না। সত্যের যথার্থ উপলক্ষ্য জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি চাই এবং শিল্পী তাহা দিয়াই রসের স্থষ্টি করেন। যে ভাব-সত্যটি কোনো বস্তুকে আশ্রয় করিয়া গোপন থাকে, শিল্পীর দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে এবং তাহার রচনায় প্রকাশ পায়।

চতুর্থত, শিল্পবস্তু কোনো প্রকৃত বস্তুর অনুকরণ নহে, ইহা স্বাধীন স্থষ্টি—‘মোনা আৰ মিনাকাৰি দিয়ে এমন অভ্রাস্ত আকৃতি দিলে স্বৰ্ণকাৰ মোনাৰ প্ৰজাপতিকে যে ভুল হল আদল ব’লে ; এটা খুব কৌশলেৰ পৰিচয় দিলে, কিন্তু শিল্পীৰ শিল্পজ্ঞানেৰ খুব পৰিচয় দিলে না এ ভাবেৰ সন্দৃশ্যকৰণ’ (পৃ ৩১১)। এই ধৰনেৰ ভৱিষ্যত জাগানো নিম্নস্তৱেৰ শিল্পেই দেখা যায়। উচ্চশিল্পে যে সাদৃশ্য দেখাৰাব চেষ্টা কৰা হয় তাহা বস্তুমূলক বা ঘটনামূলক নহে তাহা কল্পনামূলক ও ভাবমূলক সাদৃশ্য। রবীজ্ঞনাথ বলেন, ‘ধ্যানকৰ্পেৰ সহিত কল্পনকৰ্পেৰ সাদৃশ্য’। অৰ্থাৎ কোনো বস্তুকে আশ্রয় কৰিয়া যে কল্পনারাজ্য লোকচক্ষুৰ অন্তরালে মেলা বহিয়াছে এবং যে ভাবগুলি তাহাতে অন্তর্নিহিত বহিয়াছে তাহাই শিল্পীৰ অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টিতে ধৰা পড়ে এবং শিল্পীৰ শৃষ্টিতে প্ৰকাশ পায়। বড় শিল্পী কোনো বস্তুৰ বহিবাকৃতিকে ছবছ অনুসৰণ কৰেন না, বৰং সেই বস্তুৰ বিশেষ ভাবটিকেই ঝুটাইতে চান। অবনীজ্ঞনাথ বলেন, ‘এ-ফেত্ৰে রূপ ও কল্পনা হইই ভাৰ-ব্যঙ্গনাৰ কাজে লাগল, এবং ভাৰ ও ৰসই এখানে প্ৰাধান্ত পেলে দৃষ্টি ও এবং কল্পিত হয়েৰ উপরে’ (পৃ ৩১৩)।

পঞ্চমত, শিল্পস্থষ্টি বহিঃপ্রকৃতিৰ অনুকৰণ নহে, ইহা শিল্পীৰ স্বকীয় স্থষ্টি ; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অনাহষ্টি বা হষ্টিছাড়া খাপছাড়া একটা-কিছু নহে এবং ইহাৰ আবেদন সকলেৰ কাছেই আছে। ভাৰুক-দৃষ্টি সাধাৰণ কাৰ্যকৰী দৃষ্টি নহে, কিন্তু উটাপাণ্টা কৰিয়া দেখিলেই যে ভাৰুকেৰ মত দেখা হইল এবং সৌন্দৰ্যৰস আসিল তাহা মনে কৰা ভুল। শিল্পী কল্পনাকুশলী ও ভাৰুক, কিন্তু তবু তাঁহাৰ কল্পনা ও ভাৰ মূলে বাস্তবকে আশ্রয় কৰিয়া। ‘সত্যপীৱেৰ মাটিৰ ঘোড়া, কালীঘাটেৰ পট, নতুন বাংলাৰ আমাদেৱ ছবি, পুৱানো বাংলাৰ দশভুজা— এৰ

একটা ও নিছক কাল্পনিক বস্তু নয়। এরা সবই বাস্তবকে ধরে তবে তো প্রকাশ হল। মন যে বাস্তবকে স্পর্শ করেই আছে; নানা বস্তুর নানা ভাবের স্থূলি জমা হচ্ছে মনে। নিছক কল্পনা— সে মনেই উঠত মনেই থাকত, যদি-না বাস্তবজগতের ভাব ও ঝুপের সংস্পর্শে সে আসত।' (পৃ ১৩০-১)। শিল্পী বাস্তব ও কল্পনার সম্মিলন— 'বাস্তবকে কল্পনা থেকে কতখানি সরালে কিম্বা কল্পনাকে বাস্তব কর্তৃ হিটিয়ে নিলে art হয় এ তর্কের মীমাংসা হওয়া শুভ, কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, চোখে-দেখে জগতের সঙ্গে মনে-ভাবা জগতের মিলন না হলে art হবার জো নেই এটা দেখাই যাচ্ছে' (পৃ ১৩২)। অপর স্থলে বলা হইয়াছে যে, এই ভাব-সত্য সত্ত্বেরই এক রূপ এবং সকলের গ্রহণীয়, কারণ ইহা শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাব বা কোনো-একটি অলীক মায়া নহে— 'মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে, কিন্তু অনেকের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না।' (পৃ ৩৭১)। ভাবের বস্তু মায়ার অতীত এবং সে সত্ত্বেরই রূপ। তাই তাহার আবেদন সর্বজনীন।

ষষ্ঠত, অবনীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যাভূতিকে সাধারণ স্থুল, কার্যকরী বুদ্ধি এবং বিচারবুদ্ধি হইতে পৃথক রাখিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য, কারণ স্থুলের আনন্দকে প্রায়ই আমরা ভোগবিলাসের স্থুলের সহিত মিশাইয়া ফেলি। অবনীন্দ্রনাথ এখানে যে নির্দেশ দিয়াছেন— রবীন্দ্রনাথও 'সৌন্দর্যবোধ' প্রযুক্তে তাহাই বলিয়াছিলেন। শিল্পগুরু এস্থলে বলিতেছেন, 'বেতাল-পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ-চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারতো, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা, অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা, এ-দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিংবা কাষভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই

এটা' (পৃ. ৩৮)। বিলাসী বৃহৎসত্য ও সুন্দরকে পায় না— 'বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে স্থিতির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মাঝুষটাকে বাস্তবিকই অঙ্ক ক'রে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাঘভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি— স্থিতির অপরূপ বহস্তের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মাঝুষকে' (পৃ. ৪০)। বিলাসীর দৃষ্টি যেমন সত্য ও সুন্দরকে আবৃত করে কার্যকরী দৃষ্টিও তাই করে— 'কাঘের দৃষ্টি মাঝুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিসকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থ ভাবে স্থিতির সামগ্ৰী স্পৰ্শ করে' (পৃ. ৪৫)। শিল্পী কোনো বস্তুকে তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ হিসাবে দেখেন না, বস্তুটির যথার্থরূপে দেখিতে চান; সেটিকে তাই আপনা হতে দূরে রাখিয়াই ভাব দ্বারা তাহার সহিত শিল্পী যুক্ত হইতে চান। এই শিল্পদৃষ্টি কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সকানী দৃষ্টি নহে। এই দৃষ্টি দ্বারা যে সত্যকে পাওয়া যায় তাহা অনুভবের সত্য, নিছক জ্ঞানের নহে— 'বহিৰ্বাটীর বাস্তাঘাট নিয়ম-কালুন সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আৰ রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা' (পৃ. ৩৪)। পশ্চিমের দার্শনিকেরাও বিচারবুদ্ধিকে শিল্পস্থিতি বা সৌন্দর্যবোধের অবলম্বন মনে করেন না— বোধিকে (Intuition বা Imagination) প্রাধান্ত দেন। বুদ্ধি বস্তুকে তাহার কার্য-কারণ সম্বন্ধে অন্য বস্তুসকলের সহিত জড়িত করে এবং একটি বৃহৎ বস্তুসমষ্টির ক্ষুদ্র এক অংশ কৃপেই তাহাকে দেখে। বোধি কিন্তু বস্তুটিকেই স্বতন্ত্র ও বৃহৎ করিয়া দেখে এবং তাহার মধ্যেই সত্যের আভাস দেখে। এইজন্যই শিল্পীর চোখে বস্তুটি সুন্দর ও ভাবময় হইয়া প্রকাশ পায়।

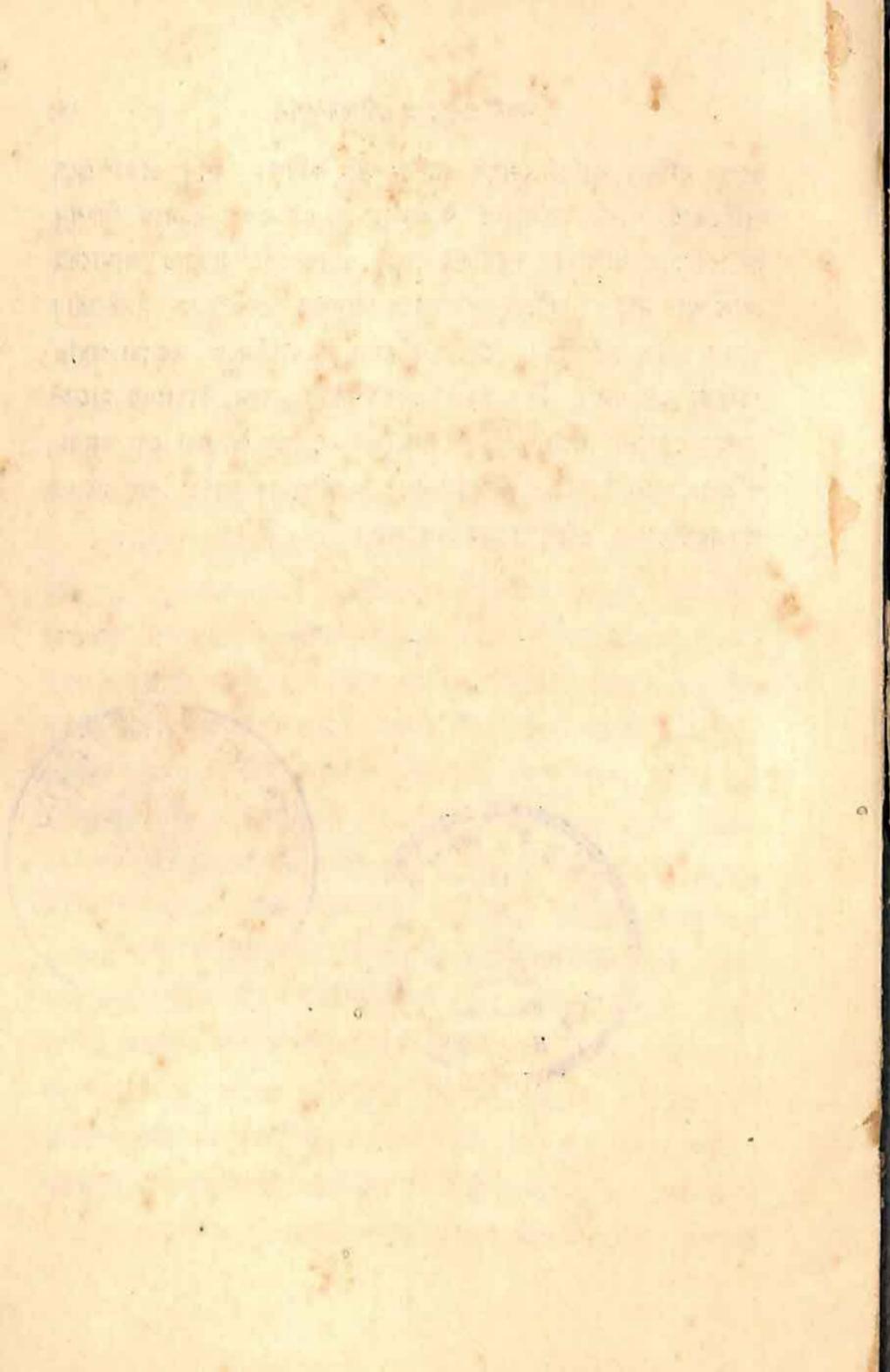
সপ্তমত, আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুর সহিত তাহার আশ্রয়ের অচ্ছেদ্য যোগ আছে— তাহাদের ভিন্ন করিয়া দেখা

ତୁଳ । ଅବନୀଜ୍ଞନାଥ ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷଭାବେ ବଲିଆଛେ । ଶିଳ୍ପ-  
କୋଶଳକେ ତିନି ଶିଳ୍ପେର ବହିରଙ୍ଗ ମନେ କରେନ ନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପବସ୍ତୁକେ ଆଶ୍ରୟ  
ବା ଆଧାର ହିତେ ପୃଥକ କରିଯା ଶିଳ୍ପେର ଶବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାର ତିନି  
ବିରୋଧୀ । ଅବନୀଜ୍ଞନାଥ ବଲେନ, ‘ଶୁନ୍ଦର ଜିନିଦେର ବାଇରେ ଉପକରଣେ  
ଆର ଭିତରେ ପଦାର୍ଥେ ହରିହର ଆଜ୍ଞା— ସେମନ ରୂପ ତେମନି ଭାବ ।  
ବହିରଙ୍ଗ ଯା ତାର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତରଦ୍ଵେର ଅବିଚ୍ଛେତ ମିଳନ ଘଟିଯେ ଶୁନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ  
ହଲ ।’ (ପୃ ୨୧୦) । ସ୍ଵତରାଂ ଏହିଭାବେ ଦେଖା ଯାଉ, ଭାବ ଓ ତାହାର ଭାବା  
ଉଭୟେର ସୁତ୍ର ସମସ୍ତେଇ ମାର୍ଗକ ଶିଳ୍ପରୁଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମୌନଦ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ।

“ବାଗେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ”ତେ ଆରା ଅନେକ ସମ୍ପାଦନ ଶୁନ୍ଦର ସମାଧାନ  
ବହିଆଛେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହେ ମେ-ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ହିଲ ତାହା  
ହିତେଇ ବୋବା ଯାଉ— ମୌନଦ୍ୟ-ଦର୍ଶନେର ରୂପ ଓ ବିଷୟ କି ପ୍ରକାର ଏବଂ  
ଇହାତେ କତ ରକମ ସମ୍ପାଦନ ଆସିତେ ପାରେ । ସମ୍ପାଦନ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ତର୍କ  
ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନା ହିତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଭାଲୋ ଭାବେ ବୁଝିତେ  
ହିଲେ ଆମାଦେର ଏମନ-କୋନୋ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରିକଣ ଯିନି ନିଜେ  
ଏକାଧାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଏମନ ଲୋକ ବିରଳ ।  
ଶିଳ୍ପିଗଣ ବେଶିର ଭାଗ ରଚନାକାରୀରେ ଯୁଗ୍ମ ଥାକେନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋନୋ  
କଟିନ ଚିନ୍ତା ବା ଚର୍ଚା କରିବାର ଅବକାଶ ପାନ ନା । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଦାର୍ଶନିକଗଣ  
କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚିନ୍ତାଯାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାକେନ, ତୁଲି ବା ଲେଖନୀ ଧରିବାର ଅବସର  
ତ୍ବାଦେର ଥାକେ ନା । ଅବନୀଜ୍ଞନାଥେର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ଦୁଇଯେଇ ସମସ୍ତ  
ଦେଖି, ସ୍ଵତରାଂ ତ୍ବାଦାର କାହେ ଶିଳ୍ପ ଓ ମୌନଦ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ  
କରିତେ ପାରି । ସ୍ଵର୍ଗଗତ ଆଶ୍ରତୋମ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମହାଶୟ ଏହି ଆଶାତେଇ  
ତ୍ବାଦାକେ କଲିକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ ‘ବାଗେଶ୍ୱରୀ’-ଅଧ୍ୟାପକ ପଦେ ବରଣ କରେନ ।  
ଆଶ୍ରତୋବେର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଯାଇଲ । ଶିଳ୍ପୀ ତ୍ବାଦାର ତୁଲି ରାଖିଯା କଲମ  
ଧରିଲେନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଓ ମୌନଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତ୍ବାଦାର ଅରୁଭୁତିରାଶି ଅକ୍ଷରେର

কুপে নামিয়া আসিয়া অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিল। দর্শন প্রকাশণে সাহিত্যের আসন অলংকৃত করিয়াছে। এই রকম রচনার নির্দশন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রবক্ষাবলী ব্যতীত আমাদের দেশে আর নাই। সৌন্দর্য-দর্শন সম্বন্ধে বিদেশীয় কয়েকটি গ্রন্থ সাহিত্যের ভাষায় রচিত হইয়াছে। প্রেটে, হেগেল ও রাস্কিনকে তন্মধ্যে প্রধান রচয়িতা বলা যাব। কিন্তু ইহারা কেহই শিল্পী নহেন, তাঁহাদের হাতে-কলমে কোনো শিল্পের সহিত যোগ ছিল না, শুধু প্রতিভা এবং কল্পনা-শক্তির জোরে তাঁহারা লিখিয়াছেন। অবনীলনাথ স্বয়ং শিল্পজগতের পথপ্রদর্শক এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের চিন্তাগুরু।







## বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

এই গ্রন্থমালার জন্য বিশ্বভারতী জাতীয় অভিনন্দন নাড়ের ঘোষণা  
করিয়াছেন।

প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থোজনীয়  
পুস্তকসমূহের স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ করিবার বিভিন্ন অতিথীর  
আছে। বিশ্বভারতী বাংলাদেশে সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ব্রতৌ  
হইয়াছেন।

—দেশ

সহজ গ্রন্থমালার যে ক'টি গুণ তার প্রায় সবগুলিই এখানে বর্তমান ;  
চেহারাম আশ্চর্য আকর্ষণ, দাম অত্যন্ত সন্তোষ, ছাপা ঝকঝকে পরিষ্কার।

—সংকেত

অন্ন কথায় অনেক কথা ব'লে নৌরসকে অন্ত করা হয়েছে, এমন গ্রন্থ পেতে  
হলে এই সিরিজের দিকে তাকাতে হয়।

—পূর্বশা

আমাদের ইস্কুল-কলেজের ভ্রাতৃক শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধক রূপে  
এ ধরনের বই যত বেশি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় ততই ভালো।

—কবিতা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ নামক যে গ্রন্থমালার আয়োজন করিয়াছেন  
তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা  
করিবে। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা নিশ্চিতই জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের  
কল্যাণ সাধন করিবে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা বিষয় ৩৪ লেখক নির্বাচনে, মুদ্রণের পারি-  
পাটে, মলাটের সৌষ্ঠবে যে প্রকাশন-দক্ষতার পরিচয় দেয়, বাংলাদেশে  
তা অভূতপূর্ব।

—পত্রিকা

॥ এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে ১০৮ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে  
পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে ॥

প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট টাঙ্কা